শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প

রাখালরাজ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শিবরাণী প্রকাশনী
৮বি/২ টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৬২

প্রকাশক
শিবরাণী প্রকাশনী
৮বি/২ টেমার লেন
কলকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক
শ্রীবিকাশ দত্ত,
নিউ ভোলাগিরি প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

অভিশপ্ত মেস

কলেজে পড়ার হয়ত কোন পথই ছিল না সিরাজের। তবু ও বহু কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে কলেজের রঙীন গণ্ডীতে প্রবেশ করল। পড়াশোনায় সে খারাপ নয়। তবে সংগীত এবং আবৃত্তি তার প্রতিভার দুটি দিক।

কলেজ হতে বার মাইল দূরে এক ঝোঁপঝাড়ে ভরা কাদামাটির গ্রামে সিরাজের বাড়ী। বাড়ীর অবস্থা এক কালে ভালই ছিল। বর্তমানে রাজনীতির উগ্র তাপে সবই বর্গা হয়ে গেছে। যা ভাগ পায় তাতে সংসার চলে না। তাই মধ্যবিত্তের সন্তানটি দারিদ্রের সীমাহীন অন্ধকারে।

দুই দাদা ও দুই বৌদির কাছে বিধবা ভাগের মা এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছে; যেন বিশাল সমুদ্রের জলে মুখ বের করে মৃত্যুর চিন্তায় ব্যস্ত। কূল নেই। ভরসা নেই। ভরসা শুধু সহায়-সম্বলহীন সিরাজ শেখ।

সকাল হতে ছেলে পড়িয়ে বাসে করে রোজ কলেজে আসে সিরাজ। বড়ই কষ্ট। কিন্তু কি করবে। রাজনীতির দাপট!

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে প্রাণ জুড়ান হাওয়া। কখন কখন শুষ্ক বালুয়ারী ঝড়। ফাঁকা মাঠে বিরাট প্রাসাদ। সাঁইথিয়া অভেদানন্দ কলেজ।

গ্রামের ছেলে শহরে ছেলেদের সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারে না। অবশ্য সে চেষ্টাও করে না। কোন রকমে পাশ করে ছোটখাটো একটা চাকুরিই তার লক্ষ্য।

ভর্তির পর বেশ কয়েক মাস কেটে যায়। আসে সরস্বতী পূজো। ঠিক হয়েছে জলসা হবে। ক্লাসে ক্লাসে পড়েছে নোটিশ।

সিরাজদের ক্লাসের, অর্থাৎ এগার ক্লাসের ছাত্রী শবরী ভাল গান করে। তার রবীন্দ্রসংগীতে অনেকেই মুগ্ধ। তার গানে মুগ্ধ পিন্টু ও! পিন্টু শবরীর কাছে প্রস্তাব রাখে। রিক্সা হতে শবরী নামতেই পিন্টু বলে—কি শবরী নাম দেবে না?

—কিসে?

—কেন রবীন্দ্রসংগীতে।

—ফাংশনটা কবে?

—সরস্বতী পুজোর পরদিন।

—আমার ইচ্ছে নেই।

—কেন তোমার অত সুন্দর গলা! গলার অবমাননা করছ!

—আমার গান কবে শুনলেন?

—কেন যুব-উৎসবে।

—আমি রাতে এসে গাইতে পারব না।

—কৈন তোমার অসুবিধা কি?

—বলতে পারছি না।

শবরী ধীরে ধীরে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ক্লাসের দিকে এগোতে থাকে। পিন্টুও পিছু পিছু। ক্লাসে ঢোকা মাত্রই মেয়েরা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। পিন্টু কিছুটা ইতস্ততঃ হয়ে বলে, তোমরা হাসছ কেন? হাসছ কেন?

শবরী রেগে ওঠে, বলে আমি গান গাইব না আপনার কিছু বলার আছে! পিন্টুর মুখ লাল হয়ে যায়। বন্ধুদের কাছে সে হেরে যায়। ক্লাসে হাসির রোল পড়ে যায়।

সিরাজ কিন্তু সুযোগ খোঁজে। পিন্টু ক্লাস থেকে বেরোতেই তার হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দেয়। পিন্টু নাক সিটকিয়ে বলে—আরে গেঁয়ো ভূত কি গাইবি!

পিন্টুর নাকসিটকানীতে সিরাজ হতাশ হলেও মরিয়া হয়ে বলে, একবার চান্স দিন না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রাজকুমার অবশ্য সিরাজকে আশ্বাস দেয়। সিরাজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বৈদ্যুতিক আলোয় জমকালো ষ্টেজে অনুষ্ঠান করার সুযোগ পায় সিরাজ। ভরাট গলায় গেয়ে ওঠে রবীন্দ্রসংগীত "ভরা থাক ভরা থাক, মুগ্ধ হয়ে যায় কলেজের ছেলে মেয়েরা, চমকে ওঠে শবরী, কারণ সে কলেজের সেরা গাইয়ে। কিন্তু সিরাজের গলা তার চেয়ে অনেক ভাল।

গোপন তারে তারে টান পড়ে সিরাজের। তবে সে বড় লাজুক, লড়াকু নয়। মৃদু ইশারা সৃষ্টি হয় চোখের কোণে কোণে, মুখে লজ্জার ভাব থাকলেও সিরাজ একটু মরিয়া হয়ে ওঠে।

সেদিন ক্লাসের মধ্যে দারুণ হৈচৈ পড়ে যায়, ডায়ারী হতে শবরীর রঙীন ফটো চুরি হয়ে যায়। শবরীর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে, সকল মেয়েদের মধ্যে বেশ উদ্বেগের ভাব। শবরীর ক্লাসেরকে সন্দেহ করে তাদের মধ্যে সিরাজ পড়ে নি। কারণ একটা গ্রাম্য নিরীহ বালক কি কোনদিন শহরে জাঁদরেল মেয়ের ছবি চুরি করতে পারে! একটা রহস্যের জাল ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত কলেজে। সিরাজ কলেজের আনন্দের স্বাদ পায়। সে পড়াশোনার অসুবিধার জন্য বাসে যাতায়াত বন্ধ করে দিল। এবং নেতাজীপল্লীতে একটা মেসে নিজের স্থান করে নিল। কয়েকটি ছেলেকে পড়িয়ে যা আয় হয় তাই তার সম্বল, তবে তা থেকে মাকেও কিছু পাঠাতে হয়। মেসের সঙ্গী বলতে সমরেশ দাঁ সংগীত শিল্পী, সপ্তম আচার্য্য কাপড় ব্যবসায়ী আর বিমান বাবু রিটায়ার্ড অফিসার, সকলেই সংস্কার মুক্ত। জাতিভেদ নেই, তিন জনেই খুবই অভিজ্ঞ। মানুষকে ঘৃণা করার কোন মানসিকতা তাদের নেই।

সমরেশ বাবু সিরাজকে খুবই ভালবাসে। তবে সিরাজের মনের কথা হয় বিমানবাবুর সঙ্গে, বিমানবাবুর সঙ্গে সম্পর্কটাও মধুর করে নিয়েছে। বিমান-বাবুকে সে দাদু বলে।

বিমানবাবু কথায় কথায় বলে—কি হে প্রেমের থলিটা একটু দূরে ফেলে দাও।

সিরাজ মুচকি হাসে।

—তোমার এ কি ধরনের ভালবাসা। কথা নেই শুধু ইশারা।

—বড় কঠিন ভালবাসা দাদু।

—কঠিন কি হে বড় বেদনাদায়ক।

চারজনের মেসের নাম "অভিশপ্ত মেস"। কেহই সংসার ধর্মে জড়িত হতে পারে নি। প্রত্যেকের ফেলে আসা জীবন বড় বেদনাদায়ক, বিমানবাবুর পেনশনে চলে। সমরেশবাবু সঙ্গীতের শিক্ষক, আর আচার্য্যবাবু কাপড়ের বোঝা নিয়ে ষ্টেশনে বসে থাকে। দুঃখের আঘাতে দুঃখ বিতাড়িত, শক্ত শ্যামলা যৌবনের লেশ নেই এতটুকু। তাই মেসের নাম "অভিশপ্ত মেস।"

সিরাজের সব কথা, ভিতরের আন্দোলন। সব কিছুই সকলে জেনে ফেলে, সমরেশবাবু অবশ্য শবরীর সঙ্গীতের শিক্ষক। সিরাজ একথা জানতে পারলে

একটা মৃদু হাসি বেরিয়ে আসে। সমরেশবাবুর পিছন ধরে, সমরেশবাবুও বলে আমার সঙ্গে শবরীদের বাড়ী চল, তবে একটা কথা কি জানিস ওরা সরকার পরিবারের মেয়ে। বিরাট বড় লোক, ওর প্রত্যাশা করা বৃথা। তারপর ওর বোধ হয় বিয়ে হচ্ছে একজন বড় বাস্তকারের সঙ্গে।

—বাস্তকার! কিছুটা শুনেছি,…আমি কোন আশা নিয়ে যেতে চাই না।

—তাহলে?

—কারণ আমি তো বিধর্মী।

—সিরাজ! দেখাবার হলে বুকটা খুলে দেখাতাম তোকে।

—বুঝি সমরেশদা সবই বুঝি। কিন্তু ভালবাসার অধিকার তো আমার আছে।

সন্ধ্যার পর রাস্তায় রাস্তায় লাইট জ্বলে ওঠে, দুজনে বেরিয়ে পড়ে। শবরীদের বাড়ীতে সমরেশবাবুর খুবই খাতির, শবরী সিরাজকে দেখে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যায়। পর্দার আড়াল হতে দুটো জলন্ত চোখ এসে পড়ে সিরাজের উপর। সিরাজের মুখের উপর নীরবতার ছাপ। মলিনতার আলপনা, তার উপর আবার রক্তের দাগ পড়ে যায় যখন শবরীর মা হাসতে হাসতে এসে বলে শবরীর বিয়ে ২৭শে বৈশাখ।

সমরেশবাবুর মুখ হতে কৃত্রিম হাসি বেরিয়ে আসে। সিরাজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। পরিচয়ে তাঁর মুখটা একটু কুঁচকে যায়, জলখাবারের তেমন উৎসাহ দেখায় না। সিরাজ সম্পর্কে অনেক কথাই সমরেশবাবু বলে। কিন্তু শবরীর মা চুপচাপ শুনে যায়।

সমরেশবাবু আর বেশীক্ষণ বসে না, বস তুই বলে বেরিয়ে পড়ে। শবরীর চঞ্চল চোখ দুটো পড়ে সিরাজের দিকে। তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে, শবরী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিরাজের পদক্ষেপ শুনতে থাকে।

সিরাজ গ্রাম হতে ধাক্কা খেয়ে শহরে পেল যন্ত্রণা।

সারা রাতের ঘুম তার হারিয়ে গেল। শবরীর রঙীন বাঁধানো ছবিটা টাঙিয়ে রেখেছে ঠিক আয়নার পাশে। শুয়ে শুয়ে মুখ দেখে আয়নায়, পাশে শবরীর ছবি। সিরাজ রাতের খাবার না খেয়েই শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার ঘুম

নেই। মুখের ছবি পড়ে আয়নায় চোখ দুটো শবরীর ছবিতে। সে আপন মনে বলে ওঠে—শবরীর জীবনে কত আনন্দ কত সুখ ফুটে উঠবে। ফুলশয্যার রাত হয়ে উঠবে কত সুন্দর। শবরী একজনের কোলে ঢলে……

বিছানা হতে উঠে বসে, দেওয়ালের মাঝ হতে কোন কথা আসে না। নীরব ঘরে শুধু নাইট বাল্বটা জ্বলতে থাকে।

সমরেশবাবু বলে ওঠে—কিছু খেলি না, রাত জাগিস না। মনকে বোঝা।

সিরাজ নিজেকে ঠিক বোঝাতে পারে না। সে নিজেকে নিয়ে যেতে চায় এক অন্ধকারময় পৃথিবীতে। সেও চলে যেতে চায় শবরীর সঙ্গে। শুধু পাশে পাশে থেকে ভালবেসে নিজেকে শেষ করতে। তাই সে স্বপ্ন দেখে শবরী যেখানে থাকবে সেই ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার কলোনীর। সিরাজ ২৭শে বৈশাখের পর দাঁড়ি কাটা বন্ধ করে দেয়। এবং বেশীর ভাগ সময়েই ঘরের মধ্যে থাকে। এইভাবে দিন কাটতে থাকলে মেসের সকলেই বলে—তোর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তুই শেষ হয়ে যাবি। উত্তরে শুধু বলে, শেষ তো হয়ে গেছি। শেষ হওয়ার আর কিছু নেই।

অভিশপ্ত মেসকে বিদায় দিয়ে তাই বেরিয়ে পড়ে ব্যাণ্ডেলের দিকে। সম্বল কাঁধে একটা ব্যাগ। সংকল্প সেখানে প্রাইভেট পড়িয়ে খাবে। মেসের তিন জনের চোখে জল আসে। কারণ তাদের জীবনও অভিশপ্ত। ফেলে আসা জীবনের কথা মনে পড়ে তাদের।

শবরীর বিয়ের ছ মাসের মধ্যে সিরাজ উপস্থিত হয় ব্যাণ্ডেলে। এ প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরে একটু বাসস্থানের জন্য। অবশ্য শবরীর ঠিকানা বের করতে দেরি হয় নি। সেটা সে জোগাড় করেছিল সমরেশবাবুর মাধ্যমে।

তপ্ত রোদের বেলায়। পড়ন্ত বিকালে ঘোরে এখানে সেখানে। অবশেষে এক কামারের বাড়ীতে আশ্রয় চায়। কামারের বাড়ীতে দুজন সদস্য। কামার নিবারণ কর্মকার এবং তার স্ত্রী সনকা।

প্রথমে বিফল হলেও আশ্রয় একটু জোগাড় করে। কারণ কামারের স্ত্রী জাতিতে ছিল মুসলমান। এখন কর্মকার। সহানুভূতির আলিঙ্গনে টানে সিরাজকে—

কোথায় বাড়ী ?

—সাঁইথিয়া।

—সাঁইথিয়া!

সনকা যে মেয়েটির বাড়ীতে কাজ করে তার বাড়ীও সাঁইথিয়া। অবশ্য সে জানে সনকা হিন্দু। সনকা অবশ্য সিরাজকে তার পূর্ব ইতিহাস বলে না। সনকা কাউকেই বলে নি। সেও বিতাড়িত।

সনকার সন্দেহ জাগে। সিরাজকে সব সময়েই উদাসীন দেখে। সে নিজের মতো করেই খাওয়ায়। বকে। উপদেশ দেয়। অবশ্য সিরাজ সনকাকে তার সমস্ত কথা না বলেও পারেনি। খুলে বলেছে। সনকার সহানুভূতি সিরাজকে মুগ্ধ করে।

সনকা কথায় কথায় শবরীকে বলে—সাঁইথিয়া থেকে একটা ছেলে এসেছে।

—সাঁইথিয়া থেকে? কী নাম?

—সিরাজ সেখ।

—সিরাজ! কিন্তু ও যে মুসলমান!

—তাতে কি আছে। মানুষ তো।

—সনকা!

শবরীব চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। যেন শবরী ঝাঁপ দিয়ে একটু এগিয়ে চেতে চায়।

—ভাল গান জানে।

—তাই!

—কবিতা পড়ে খুবই সুন্দর। আমাকে খুবই খাতির করে। বড় মায়াবী।

শবরী কোন কথা বলে না। বলে তাড়িতাড়ি কাজ করে নে। আমি একটু বাজারে যাব।

সনকা কাজ করে বাড়ী ফেরে। বেশ রাত। নিবারণ তাসের আড্ডায়। সিরাজ একটা লণ্ঠন জেলে চুপ করে বসে আছে। চোখের সামনে তার দুটি রূপ, এক ভাগেব মা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বেকার। ভূমি পরিত্যক্ত। অন্যদিকে প্রেয়সী। দুই এর মাঝখানে একটা চাবুক মারতে সে চায়।

—বৌদি একটু জল দেবে।

—কেন দেব না। জলের গেলাস এনে বলে—আজ তোমার কথা হচ্ছিল। তোমাকে গভীর ভাবে ভালবাসে।

—না বৌদি আর নয়।

—কেন তোমার আবার কি হল।

—কিছু না। আমার ভালবাসার মূল্য দিতে চায়।

—কি মূল্য দেবে?

মৃদু হাসে। সমরেশদা বলেছিল আমাদের এক সেকেণ্ডের জীবনকে আমরা নিয়ে যাই পঞ্চাশ বছর। একশ বছরে। শুধু মায়ার টানে। কিন্তু এক সেকেণ্ডেও তো শেষ করা যায়।

—সমরেশ দা কে?

—আমার গুরু।

—তুমি হতাশ হয়ো না। কত মেয়ে পাবে।

—না বৌদি তা হলে ভালবাসার মূল্য কোথায়?

—তুমি ভুল করো না।

রাতের খাবার করতে ব্যস্ত হয় সনকা। সিরাজ ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সনকা চিৎকার করে ওঠে। পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। নিবারণ হতভম্ব হয়ে যায়। সনকা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি দেহটা পুড়িয়ে দেয় শ্মশানে নিয়ে গিয়ে।

সনকা ব্যাগ খুলে দেখে শবরীর একটা রঙীন ছবি, এবং একটি চিঠি—

শ্রীচরণেষু,

বৌদি আমার মৃত্যুর পর পারলে শবরীর হাতে চিঠিটা তুলে দেবে। এবং বলবে কলেজ জীবন হতে একটা অপদার্থ ছেলে যে ভালবাসা বুকের মধ্যে বহন করে চলেছিল তার আজ চির সমাপ্তি। ভালবাসার মূল্য ভোগের মধ্যে মাপা যায় না। শবরীকে সুখে থাকতে বলো। তুমি প্রণাম নিও। ইতি—

সিরাজ

পরের দিন কাজ করতে গিয়ে সনকা চিঠিটা এবং ফটোটা দেখায়। অবশ্য সে নিবারণকে কোন কথা বলে নি। শবরী ফটোটা দেখে বলে—এ ফটো আমার কলেজে চুরি গেছিল। কিন্তু মারা গেল কেন?

—কি জানি' চোখের জল মোছে।

শবরীর বুকের ভিতর একটা বিরাট ঝড় উঠে। সে তার স্বামীকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা তুমি তো বিদেশী সভ্যতায় মানুষ। তোমাকে একটা কথা বলব?

একশ বার বল।

—এখন যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, আমার কি করা উচিত?

—সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—তুমি হলে কি করবে?

—ভালবাসা গভীর হলে নিশ্চয়ই বিয়ে করব।

—জান আমাকে একজন গভীরভাবে ভাল বাসত' সে কাল শেষ হয়েছে শুধু আমার জন্যই।

শবরীর স্বামী নিতাই বাবু বলে—এর জন্যে দায়ী কে?

—আমি। কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ·····।

—কিন্তু বিয়ের আগে?

—ভালবাসাটা ছিল নীরব। শুধু ইশারার, কথায় নয়।

—যন্ত্রণাময় ভালবাসা। উচ্চ সভ্যতায় প্রিয়, বিয়েটা কোন ফ্যাক্টর নয়।

—তুমি কি মন থেকে বলছ?

—তা হয়ত নয়। তবে একটা সমাজের কথা বলছি। যেখানে জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন নেই।

শবরীর চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। নষ্ট পচা সমাজের ছবি দেখতে থাকে। অনেক দূরে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে দৃষ্টি। শবরী আঁতকে ওঠে, চিতার আগুনের ছাই নিয়ে মুছে দিতে চায় সিঁদুর। সহিষ্ণুতা সতীত্বের বুকে হানে পদাঘাত। শবরী স্বপ্ন দেখে ভাঙার, স্বপ্ন দেখে পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছল সমাজের যেখানে কোন বাধা নেই, যেখানে কোন ভেদাভেদ নেই। যে সমাজ শুধু মানুষের।

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

ঢং ঢং করে ঘড়িতে ছটা বেজে গেল। পিয়ালী লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল ওর অফিস আজ বন্ধ। ইচ্ছে হল আরেকটু আমেজ কাটিয়ে নিতে। তারপর ভাবল না আজ কোনো বন্ধুর বাড়ী গিয়ে জমিয়ে আড্ডা দেবে। বিছানা থেকে উঠে পেষ্ট নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। চান করে এসে ঠাকুরকে পুজো দিয়ে সকালের পেপার নিয়ে বসেছে এমন সময় ঝি এসে ডাকল। ওকে চা করতে বলে আবার পেপার নিয়ে বসল। হঠাৎ একটা ছবি দেখে চমকে উঠল। ছবিটির নীচে লেখা প্রখ্যাত ডাক্তার দিবেন্দু ভট্টাচার্য্য এখন স্থায়ীভাবে ভারতে প্রেকটিস করবেন। ছবিটি দেখে মনে হল দিবেন্দু ওকে ডাকছে। ওর মনে পড়ে গেল প্রথম দিনের কথা। মাকে ট্রিটমেণ্ট করাতে দিবেন্দুর চেম্বারে গিয়েছিল। প্রথম দর্শনেই দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। মা কিছুটা আঁচ করতে পেরে ডাক্তারবাবুকে ডাকলেন। মার ডাকে ওনার সম্বিত ফিরে এল। পিয়ালী রোজই মাকে নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে ওদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়। বড়লোকের একমাত্র ছেলে দিবেন্দু আর কেরাণীর একমাত্র মেয়ে পিয়ালী। কিছুদিন পর এই বাঁধাটি আর রইল না। ওরা দুজন দুজনকে ভালবাসতে শুরু করল। দিবেন্দু পিয়ালীকে নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অবশ্য মা বাবার মত নিয়ে। ওদের দেখে মনে হোত ওরা একজন আরেক জনকে ছাড়া বাঁচবে না। একদিন পিয়ালী বলল, এভাবে আর কত দিন? এবার একটা কিছু কর। তোমাকে আমি সারাদিন সারাক্ষণ কাছে পেতে চাই। দিবেন্দু ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবনা। আমি আজই বাবার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করব।

আজ বেশ খুশী মনেই দিবেন্দু বাড়ী ফিরছে। কিন্তু বাবার কাছে কি ভাবে কথাটা বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে এখন পর্য্যন্ত ওর কাছে বাবাই সব। কিন্তু বাবার রাগ দেখে ভীষণ ভয় পায়। রাত্রিবেলা যখন খেতে বসে ভাবছে কি বলবে তখন দিবাকর ভট্টাচার্য্য বললেন, দিবেন্দু কাল কি তুমি ফ্রি আছ? কাল তোমাকে নিয়ে আমি আমার বন্ধু উমাশঙ্কর চৌধুরীর বাড়ী যাব। ওঁনার মেয়ে নন্দিতার জন্মদিন এবং ওর সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করে

আসব। মনে হল দিবেন্দুর পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। তারপর সাহস করে বলে ফেলল বাবা আমি সত্যেন গাঙ্গুলীর মেয়ে পিয়ালীকে ভালবাসি এবং ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে চাইনা। দিবাকর ভট্টাচার্য্যের ঘোর আপত্তি। তিনি বললেন, আমাদের ষ্টেটাসের সাথে ওদের একদম মিলবে না। তাছাড়া আমি উমাশঙ্করকে কথা দিয়েছি। এই কথা বলে তিনি শুতে চলে গেলেন। দিবেন্দুর ঘরে গিয়েও ঘুম আসছে না। সকালে গিয়ে পিয়ালীকে কি বলবে, কি করে বলবে যে ওর বাবা নন্দিতার সাথে ওর বিয়ে ঠিক করেছে। এই সব ভাবতে ভাবতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ রামুকাকার ডাকে ওর ঘুম ভেঙে গেল। রামুকাকা ওদের বাড়ীর কাজের লোক হলেও ওর মার মৃত্যুর পর রামুকাকাই ওকে মানুষ করেছে। রামুকাকা ওকে চা দিয়ে বলল, তোমাকে বাবু ডাকছেন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও ব্রেকফাষ্ট করার জন্য। খেতে খেতে ওর বাবা বললেন, দিবেন্দু তুমি পিয়ালীর বাবাকে আজ একবার আসতে বলবে। বলে তিনি উঠে গেলেন। দিবেন্দুর মনের ভয় এখনও কাটেনি। তবুও বাবার ভয়ে পিযালীব বাবাকে নিয়ে আসল। সত্যেন গাঙ্গুলী ও দিবাকর ভট্টাচার্য্যের মধ্যে পরিচয় হওয়ার পব দিবেন্দুর বাবা দিবেন্দুকে চলে যেতে বললেন। তারপর দুজনের মধ্যে সবকিছু পাকা কথা হযে গেল। দিবাকর ভট্টাচার্য্য পিয়ালীব বাবাকে বাড়ী পৌছে দিতে বললেন। দিবেন্দু ফিবে এসে দেখে ওর বাবা মার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। দিবেন্দু জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, আমার কিছু হয়নি। সামনের মাসেব ১০ তারিখ পিয়ালীর সাথে তোর বিয়ে ঠিক করলাম। আজ তোর মার কথা রাখতে পেরেছি বলে বুকটাকে হাল্কা কবছি। মরার সময় তোর মা বলেছিল আমার ছেলেকে কখনও মনে কষ্ট দিওনা! দিবেন্দু ওব বাবাকে বলল তুমি যে নন্দিতার বাবাকে কথা দিয়েছিলে সেটা কি করবে। তিনি বললেন, আমি ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি আমি ফাংশন এটেণ্ড করতে পারবনা। শরীরটা খারাপ। আর তোরও আজ ডিউটি আছে। দিবেন্দু আজ বাবার অন্যরূপ দেখল। ছেলেকে উনি এত ভালবাসেন যে ছেলের খুশীর জন্য এতবড় মিথ্যে কথা বললেন।

১০ তারিখ মহা ধুমধামে ওদেব বিয়ে হযে গেল। বিয়ের পর পিয়ালী ও দিবেন্দু খুব খুশী। পিয়ালী মন প্রাণ দিয়ে স্বামী এবং শ্বশুরের সেবা করছে। বউ পেয়ে দিবাকর ভট্টাচার্য্যও খুব খুশী। উনি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বউ-এর

হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। পিয়ালীর মা বাবাও মেয়ের মুখ দেখে খুব খুশী। কিছুদিন পর দুজনেই মারা গেলেন। আস্তে আস্তে পিয়ালীর কোল আলো করে একটি ফুটফুটে ছেলে হল। কিছুদিন পর দিব্যেন্দুর বাবাও মারা গেলেন। সবাই চলে গেলেও ওদের ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ যে কি হয়ে গেল। দিব্যেন্দু প্রায়ই রাত করে বাড়ী ফিরতে লাগল। পিয়ালী কি জিজ্ঞেস করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ একদিন দিব্যেন্দু একটি মেয়েকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে বলে, পিউ ওর নাম রুমা রায়। আমাদের এখানে নূতন জয়েন করেছে। তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে আসলাম। বাইরের লোকের কাছে পিয়ালী খবর পেল ওরা নাকি দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে। শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। তারপর একদিন এসে বলল, ওরা একসাথে F. R. C. S. পড়তে লণ্ডন যাচ্ছে পরশুদিন। সব রেডি হয়ে গেছে। আর তুমি তো কোনোদিনও আমাকে বাধা দাওনি। সবসময় আমার উন্নতি চাও, প্লিজ পিউ বাধা দিওনা। পিয়ালীও আর কিছু বলেনি। শুধু নীরবে চোখের জল ফেলেছে। যথারীতি ওরা চলে গেল। এখন ১০ বছরের মধ্যে একবারও পিয়ালী অথবা ওর ছেলে দীপুর কোনো খবর করেনি। আজ দিপু দার্জিলিং-এর হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করছে। পিয়ালী মাঝে মাঝে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দেখা করে আসে। হঠাৎ ঝি-এর ডাকে পিয়ালীর সম্বিত ফিরে এল। ওর মুখখানা সূর্য্যের আলোতে লাল হয়ে আছে।

শিল্পী চক্রবর্ত্তী

ওপর দিকে মাথা তুলতেই তাকে দেখা গেলো। বারান্দার জাফরীকাটা রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। গাঢ় হলুদ রঙের শাড়ি। চোখে মোহময়ী দৃষ্টি। দেখল তিনজনেই। অখিল, শুভময়, নন্দ। একবার, দুবার. তিনবার। বারবার দেখেও চোখ ফেরাতে পারছে না যেন।

অখিল মুখ দিয়ে অভ্যেস মতো একটা শব্দ করল—দেখেছিস। কে বল্‌তো?

—নতুন আমদানি মনে হচ্ছে। পবন দাদুর কোনো আত্মীয় হবে।

নন্দ বললে—কী সেজেছে রে! একবার ডাকব না কি?

শুভময় আর সময় নষ্ট করল না। সত্যি সত্যিই ডাকার ভঙ্গিতে ইশারা করল। এখান থেকে দূরত্ব মোটামুটি হাত পঞ্চাশেক। বুড়োশিবতলার এই খোলামেলা চত্বরটা যেনবা অখিল, শুভময়, নন্দদের খাসতালুক। পাড়ার যাবতীয় বাসিন্দা এবং তাদের মোটামুটি আত্মীয়দের সাতকাহন এদের নখদর্পণে। আলোচনার বিষয়ও এসব নিয়েই কেন্দ্রীভূত। সেই পাড়ায় নতুন এক তরুণীর আগমন স্বভাবতই মাথা ঘুরিয়ে দেয়। গরম গরম আলোচনায় মুখর। কিন্তু কেউই ভাবতে পারেনি যে এরকমটা ঘটে যাবে। শুভময়ের সামান্যতম ইশারায় মেয়েটা একেবারে ওদের সামনে এসে হাজির হলো। ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল—আপনারা কি আমাকে ডাকছেন?

ওরা যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে। ভাবগতিক দেখে সে হেসে ফেলল—আরে, চুপ করে আছেন কেন? আমার মনে হলো যেন আমাকেই ডাকলেন। আমি পবনদাদুর বাড়িতে এসেছি। ওঁর ছেলে আমার বাবার বন্ধু। আমার নাম কল্পনা। কল্পনা রায়।

একসঙ্গে এতোগুলো কথা অনায়াসে বলে যাওয়ার পরে সে চুপ করল। তার স্বচ্ছন্দ ভাবভঙ্গি দেখে অখিল মুখ খুলল বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আমরাও এ পাড়াতেই থাকি। আমি অখিল, ও শুভময়, আর ও হচ্ছে নন্দ।

পরের দিন সকালে দেখা গেলো কল্পনা শুভময়ের সঙ্গে স্কুটারে চেপে ঘুরছে। শুভময়ের কাঁধটা শক্ত করে ধরে বললে—আপনি এতো জোরে গাড়ি চালান কেন?

—আপনার বুঝি ভয় করছে ?

—মোটেই না। বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু, আজ অফিস গেলেন না কেন ?

—নাই বা গেলাম। ক্ষতি কী! চলুন, আপনাকে শহরের ওপাশটা দেখিয়ে আনি।

সেদিন বিকেলের পড়ন্ত বেলায় গঙ্গার জেটিতে অখিলের পাশে দাঁড়িয়ে কল্পনা বললে—আমি পূর্বদিক মুখ করে দাঁড়াচ্ছি। আমাকে নিয়ে সূর্যাস্তের একটা ফটো তুলুন।

একটা নয়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে অখিল তিনটে ফটো তুলল। তারপর বললে—বাড়ি ফেরার যখন তাড়া নেই তখন আসুন গঙ্গার পাড় ধরে খানিকটা হাঁটি।

অপরাহ্ণের এই পরিবেশটা বড় মনোরম। একটা কাশফুল টেনে নিয়ে কল্পনা বললে—আমি এখন কিছুদিন থাকব। আপনারা সত্যি বড় ভালো। একদিনের মধ্যেই সেটা বুঝে গেছি। আপনাদের কাউকে কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

অখিল গম্ভীর গলায় বললে—শুভময় কিন্তু অনেক বাজে কথা বলে। ওর সব কথা আমরাই বিশ্বাস করি না।

—তাই নাকি ? শব্দ করে হেসে উঠল কল্পনা,—কিন্তু ভালো স্কুটার চালায়। পেছনে চেপে থাকলেও এতটুকু ভয় করে না।

—স্কুটারটা ও নিজে কেনেনি। মামা দিয়েছে। ওর বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো নয়।

পরেরদিন বিকেলে কল্পনাকে নন্দর সঙ্গে দেখা গেলো ময়দানে। দু'জনে পাশাপাশি বসে ফুচকা খাচ্ছে। নরম জমিতে আঙুল চালিয়ে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে কল্পনা বললে—আমাদের কলেজ খুলতে আর ষোলোদিন বাকি। কী করে যে আপনাদেরকে ছেড়ে থাকব। আপনাদের সঙ্গে মিশে ভীষণ আনন্দ পেলাম।

নন্দ প্রসঙ্গ পাল্টাল—আপনি সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন ?

—হ্যাঁ। অবশ্য বাংলা বই। আমি ম্যাগাজিন পড়তে ভালোবাসি।

ফুচ্‌কা খেতে ভালোবাসি। কাশফুল পছন্দ করি। গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে তো ভীষণ ভালো লাগে। কাল আপনার বন্ধু আমাকে সূর্যাস্ত দেখিয়েছে।

—কে, অখিল? নন্দর গলা একধাপ খাদে নামল—ও আবার একটু বেশি আবেগপ্রবণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অখিলের শরীরে অসুখ আছে। এই তো কিছুদিন আগেই টি. বি. হাসপাতাল থেকে ঘুরে এলো। রোগটা ছোঁয়াচে।

তার পরের দিন বিকেল হওয়ার আগেই বুড়োশিবতলার চত্বরে প্রথম হাজির হলো শুভময়। স্কুটারে বসেই বারকয়েক হর্ন বাজাল। একটু পরেই এলো নন্দ। পকেটে সিনেমার দু'খানা টিকিট। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো অখিল। সঙ্গে ছাতাও এনেছে। আকাশে মাঝে মাঝেই মেঘ জমছে। শরতের মেঘ যখন-তখন ভিজিয়ে দেয়। কোনো ভরসা নেই।

নন্দ বললে—আমরা আজ সিনেমা যাবো। কল্পনা বাংলা বই দেখতে চেয়েছে।

শুভময় অবাক হলো—কিন্তু আমাদের তো আজ বেলুড়মঠ যাওয়ার কথা। ওখান থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে ফিরব—এরকমই ঠিক আছে।

অখিল আশ্চর্য গলায় বললে—সে কী! কল্পনার তো আজ আমার সঙ্গে নৌকোয় চাপার কথা। গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে ও গান গাইবে। কল্পনা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে।

ওরা তিনজনেই ঠায় অপেক্ষা করতে লাগল। ঘুরে-ফিরে বারবারই দৃষ্টি গিয়ে ধাক্কা মারে সেই জাফরী কাটা রেলিং-এ। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে ওঠে।

একটু পরে সদর দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসেন পবনদাদু। অখিল সাহস নিয়ে জিগ্যেস করে—দাদু, কল্পনা কী করছে?

—কল্পনা। সে আবার কে?

—কল্পনা। কল্পনা রায়। ওর বাবা তো আপনার ছেলের বন্ধু। আপনাদের বাড়িতে এসেছে।

—ও, তোমরা ছবির কথা বলছ। সে তো চলে গেছে।

—চলে গেছে! কখন? তিনজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—আজ সকালেই। ওর বাবা এসেছিল অন্য কাজে। বাবা চাইছিল ছবি এখানে কিছুদিন থাকুক। কিন্তু মেয়ে জেদ ধরে আজই চলে গেলো।

অখিল, শুভময়, নন্দরা বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেলেছে।

—ছবির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাহলে তো ওর বিয়েতে নিশ্চয়ই তোমাদের নেমন্তন্ন হবে।

শুভময় অস্ফুটে বললে—ছবির বিয়ে কখন? কোথায় হচ্ছে?

—সামনের মাসে। মেয়ে কলেজে ঢুকেই সবকিছু ঠিক করে ফেলেছে। ওদের কলেজেরই প্রফেসার। অবশ্য বাড়ির কারুর অমত নেই।

পবনদাদু চলে যেতেই নন্দ পকেট থেকে টিকিট দু'খানা বের করে ছিঁড়ে ফেলল, ধ্যুৎ! সবকিছুই মাটি হয়ে গেলো একেবারে।

অন্তরা চুপচাপ। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল এক পশলা। মেঘটুকু সরে যেতে যতোক্ষণ। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুভময় বললে—কেন জানিনা, আমাকে কাল কল্পনা হঠাৎ জিগ্যেস করে বসল, আপনি এতো বাজে কথা বলেন কেন? বেশি বাজে কথা বললে এক সময় নিজেকেই ছোটো হতে হয়।

কল্পনা হোক বা ছবি হোক মেয়েটা কিন্তু খারাপ নয়। অখিল ধীরে-সুস্থে বললে—আমাকেও বলছিল, আপনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিন। ওতে আপনার শরীর খারাপ হবে।……ভাবছি, এবার আস্তে আস্তে তা-ই করব।

নন্দ আর কোনো কথাই বলেনি। সে চোখে-মুখে যেন একরাশ দুঃখ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। জায়গায় জায়গায় মেঘ জমাট বাঁধা। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, ফের বৃষ্টি নামবে।

শরতের মেঘের স্বভাব চরিত্রই এরকম। যেখানে দাঁড়ায় সেখানটাই ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বরাকে বরাত

আসামের বরাক উপত্যকায় অবস্থিত করিমগঞ্জে নতুন চাকরি নিয়ে আসলাম ২৪ মে ৮৬। আসবার আগে পারমিতাকে বলে আসিনি, বলে আসবার সুযোগ ছিল না। ওর জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছিল। বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেস যখন একের পর এক পাহাড়, নদী, গুহা পার হচ্ছে তখন মনে হচ্ছিল আর বুঝি এ-পাহাড় নদী পার হয়ে কোনো দিন পারমিতার কাছে ফিরে আসতে পারব না। হঠাৎ ট্রেনটা একটা বিরাট অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। মিনিট তিনেক পর প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে গুহা ভেদ করে আলোর জগতে ফিরে এল। এ-রকম ভাবে প্রায় ৩৬ বার গুহা ভেদ করতে হ'ল। যতবারই গাড়ী গুহায় প্রবেশ করেছে ততবারই আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পারমিতাকে দেখতে না পাওয়ার জন্যে। অন্তিম মূহূর্ত মনে হয়েছিল এই জন্যে যে গাড়ীব মধ্যে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, সবাই চুপচাপ হযে গিয়েছিল। যতবারই গাড়ী গুহায় প্রবেশ করেছে ততবাবই প্রায় যাত্রীসাধারণ চুপচাপ ছিল, আর আমার মনে হচ্ছিল এ বিপদসঙ্কুল পথ। মনে হচ্ছিল সবাই বোধহয় জীবনেব ঝুঁকি নিয়ে চলেছে আর তাই আমি জীবনের শেষ সময় পারমিতাব কথা ভাবছিলাম। একদিন দমদমে ওদের বাড়ীতে ওর চোখের জলে আমার বুক ভিজে গিয়েছিল, আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল মানব জনম সার্থক হ'ল। ওরা পুরীতে ছিল বলে আসবাব সময় বলে আসতে পারিনি। চিঠিও দিতে পারিনা। কারণ ওর মা-বাবার কাছে আমি ওনাদের মেযের উপযুক্ত নয়। আমার চিঠি পেলে বা দেখলে হয়ত ওর শাস্তি হতে পারে এই ভযে।

করিমগঞ্জ আমার একটুও ভাল লাগছে না। চাকরি নতুন। অথচ যেন কোন উদ্যম নেই, সব কিছুই যেন অর্থহীন। জীবনের গভীরতা উপলব্ধি করবার সময় এসেছে, এবার তো উঠতেই হবে জেগে। কিন্তু পারছি না কেন? শম্ভু সাগর পার্কে বসে ছিলাম। একটা মিছিল করিমগঞ্জ স্টেশন রোডের দিক থেকে পার্কের দিকে এগিয়ে আসছে। গত ২১শে জুলাই '৮৬-তে ভাষা আন্দোলনের সময় যে-সব স্থানীয় যুবকরা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরই স্মরণে স্থানীয় বামপন্থীদের

পরিচালনায় এই মৌন মিছিল। কিন্তু আমি এ-কি দেখছি? স্বপ্ন না বাস্তব? চিৎকার করে ডাকব? মিছিলের অগ্রভাগে মহিলাদের মধ্যে ও-কে? ওকে চেনবার সুযোগ হ'ল, মিছিল এই পার্কেই শেষ হ'ল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম রহস্য উদঘাটনের জন্যে। মিছিল থেকে বেরিয়ে 'ও' এবং 'ও-র' সমবয়সী একটি মেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

পিছন দিক থেকে ভয়ে ভয়ে আস্তে করে ডাকলাম—'পারমিতা'—

'ও' মুহূর্তে আমার দিকে পিছন ফিরে তাকাল। তারপর স্থান-কাল-পাত্র ভুলে রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে, আবেগে আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। ও-র মাসতুতো বোন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। বলল—স্বপনদা, আমার দিদিকে ছেড়ে দিন, লোকে কি ভাববে? আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার নাম জানলে কেমন করে? মালবিকা বলল, সব জানি, আর নাম জানব না? পারমিতা তার বোনকে সহাস্যে ঠেলে দিয়ে বলল, আমাকে একটু কথা বলতে দে। তুই যদি এত সময় নিস তাহলে আমি কি বলব? মালবিকার মুখে উত্তর যেন তৈরীই ছিল। বলল, তোর দেখছি মনে মনে হিংসাও আছে।

সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল আমার। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এমন সময় পারমিতা বলল, কাল তোমার ছুটির পর পার্কে দেখা করবে; আজ আমার একদম সময় নেই। চলি।

আমি একটু চিৎকার করে বললাম, পার্কে নয় তুমি বরং কুশিয়ারা নদীর ধারটায় এসো, বেশ ভাল জায়গা।

ওরা চলে গেল। আমি স্বপ্ন দেখলাম না তো? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখব? না, ঠিকই আছে, সবই বাস্তব। পরের দিন দেখা হ'ল। কথা হ'ল। মন ভরল। পুরী থেকে ফেরার পর পারমিতা আমার খোঁজ করেছিল। আমারই এক বন্ধুর কাছ থেকে আমার ব্যাপারে জেনেছিল সব কিছু। জানবার পর কি করেছিল? আমিও তাই পার…কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর কি করলে, পারমিতা?

—কেন একটা গল্প বানিয়ে বাবাকে বললাম।

—কি সেই গল্প?

—বললাম, কয়েকটা খুব বাজে ছেলের খপ্পরে পড়েছি। ওরা পিছনে লেগেছে, ছেলেগুলো আমাকে বলেছে, আমাদের সঙ্গে প্রেম না করলে একদম 'লাশ' ফেলে দেব।

—তারপর?

—তারপর আর কি? বাবা বললেন, তাহলে কি হবে? পুলিশে খবর দিই, না-কি?. আমি 'মা'-কে করিমগঞ্জে থেকে পড়াশুনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ আগেই করেছিলাম। তখন মা-ই বললেন ও কে করিমগঞ্জে ও-র মাসির বাড়ি এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও। ও ওখান থেকেই পড়াশুনা করবে। ব্যস্।

—তুমি তাহলে জানতে আমি করিমগঞ্জে?

—বললাম তো, তোমার বন্ধুর কাছ থেকে সব কিছু জেনেছিলাম।

—তোমার মাসির বাড়ী যে করিমগঞ্জে সে কথা তো বলনি?

—বলবার প্রয়োজন হয়নি, তাই।

—কবে এসেছো এখানে? আমার সাথে দেখা করনি তো?

—ইচ্ছা করে। রোজ আমি ও মালবিকা কলেজ যাবার সময় তোমার শো-রুমের পাশ দিয়ে যাই। আমি ভেবে রেখেছিলাম, আমি আগে কথা বলব না।

—কেন গো। আগে কথা বলবে না কেন ভেবেছিলে?

—ইচ্ছে হয়েছিল তাই, যা-ও।

—এ্যাই দেখ পার·····, কুশিয়ারা নদীর ওপারটা বাংলাদেশ। লোকজন যাতায়াত করছে। দেখতে পাচ্ছ?

—আমি করিমগঞ্জে পুরোনো। তুমি দেখ।

—আকাশের উপরে দেখ না, মেঘের মতন, কত সত্যিকারের পাহাড়।

—পাহাড়কে আমার ভীষণ ভয়।

—কেন?

—আমার বুকে একটা পাহাড় ছিল।

—নেই, কিন্তু যদি আবার চেপে বসে?

—আর বসবে না। এবার বসলে আমিই বসব।

—তুমি কিন্তু বেশ বাজে বাজে কথা বলছ।

—আচ্ছা পার……, তুমি আমার জন্তে করিমগঞ্জে চলে এলে- কিন্তু আমি যদি এখান থেকে চলে যাই ?

—যেতে দিলে তো ?

—বা-রে, আমার তো বদলীর চাকুরি। যে কোন সময়ে বদলী হয়ে ভারতের যে কোন জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারে।

—আমিও তাহলে তোমার সাথে যাব।

—তা হলে তৈরী থেকো, যে কোন সময়ে তোমাকে সিঁদুর পরতে হতে পারে।

—আমি তো সেই জন্তেই এসেছি।

—পারমিতা, তোমার এখন কোন জায়গাটা ভাল লাগছে ? কলকাতা না করিমগঞ্জ ?

—আমার করিমগঞ্জ। তোমার ?

—আমারও। করিমগঞ্জ কত ভাল লাগছে। চাকরিও কত মন দিয়ে করছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো এতদিন পরে দেখতে পাচ্ছি। শিলং-এর পাহাড়গুলো আমাকে হাতছানি দিচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। শহর থেকে কার্ফু উঠল মাত্র কয়েকদিন আগে, কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে করিমগঞ্জ কত মধুর।

ঐ দেখ কুশিয়ারা নদীতে একটা ভারতের পতাকাধারী অপরটি বাংলাদেশের পতাকাধারী লঞ্চ এক সাথে যাচ্ছে। যাত্রীরা কেমন অন্ত লঞ্চের যাত্রীদের সাথে কথাও বলছে। কি সুন্দর না ?

—এটাকে তুমি সুন্দর বলছ ? কোথায় ভারত বাংলাদেশ একদিন একটা দেশ ছিল, কত আনন্দের ছিল, আজ আর দুটো দেশকে মিলিত হতে না দেখেও সুন্দর বলছ ?

—হ্যাঁ, নামে দুটো দেশ, কিন্তু লঞ্চ দুটো তো একই নদীতে একই সাথে চলছে।

—কিন্তু তবুও ওরা কেউ কার সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না, সেটা জানো না?

—সীমানা দিয়ে কি সব আটকানো যায়? পৃথিবীটা প্রাণী জগতের। সবার অধিকার সর্বত্র, সব সময় জানলে। ঐ দেখ দুটো পাখী বাংলাদেশ থেকে উড়ে কেমন স্বাধীন ভাবে উড়ে ভারতে চলে আসছে, ওদের পাশপোর্ট আছে?

—বলতে পারব না। কিন্তু তুমি এত গা ঘেঁসে বসো না তো, বড্ড অসুবিধা হচ্ছে আমার।

—ভয় নেই, বিনা পাশপোর্টে বাংলাদেশে যাব না। কালই পাশপোর্ট অফিসে যাব।

—ঠিক বলছ?

—ঠিক্-ঠিক্-ঠিক্।

স্বপন মিত্র

কালো চায়না উইংসাং কলমটাকে ডান হাতের আঙুলে রেখে ঐ হাতটাকে ঈষৎভাবে গালে ঠেকিয়ে সুদূর সীমাহীন শূন্য এবং বিস্তৃত নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে বিকাশ কি যেন ভেবে চলেছে অবাক বিস্ময়ে! কিছু একটা মনে পড়তেই সাদা কাগজটার উপর কয়েকটা লাইন লিখে ফেলল, "আমি প্রয়োজনে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যেতে পারি। কিন্তু, একদিন যে কাউকে ভালবেসেছিলাম তা কখনো ভুলতে পারবো না।"

হ্যাঁ, বিকাশ তার নিজের জীবন ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত। কারণ অনেক আপনার জন বন্ধু-স্ত্রী শেলিকে কথা দিয়েছে যে চিঠি লিখে মধুমিতা অর্থাৎ রাজকন্যা প্রসঙ্গে অনেক কিছু জানাবে। পৃথিবীতে বোধ হয় এত কাছের অথচ অনেক আদরের স্নেহ ভরা কেউ যদি থেকে থাকে তবে আজ সে একমাত্র শেলি ছাড়া আর কেউ নয়। বিকাশ শেলির মধ্যে আবিষ্কার করেছে এক নারীর স্নেহময়ী চিত্র। যার মধ্যে দিদি, বোন ও বৌদির আবেগ ভরা ভালবাসা লুকিয়ে রয়েছে। তাছাড়া শেলি সেই নারী যে, সত্যকারের নারীত্ব বহন করবার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীতে অনেক নারী আছে কিন্তু, সবাই আত্মত্যাগ করতে পারেনা, পারেনা শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে নিজেকে সকলের অন্তরে বিকশিত করতে।

বিকাশ লিখতে শুরু করে : শেলি, আমি যখন তোমাদের কাছে ফিরে যাব তখন দেখতে পাবো একটা ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে। যাকে আমি সমস্ত দিন শুধু কাকার স্নেহে ভরিয়ে রাখবো। সব সময় আমার কাছে ও হাজার আবদার করে যাবে। কিন্তু, কোনো সময় সে ভালবাসাহীন হবে না। জীবনের আর বাকী দিনটুকু ওর সাথে বন্ধুত্ব করেই নয় কাটিয়ে দেবো। আর কে আছে আমার এ দুনিয়ায়!

তবে শোনো শেলি, ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। চারিদিকে শুধু ঝিঁ ঝি পোকার কলরব। মা ও বাবা দুজনে আমার ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকতে থাকেন, "খোকা ওঠ, খোকা ওঠ, পুলিশ এসেছে!" আমি চোখ মুছতে মুছতে দরজা খুলে শুনি যে, আমাদের তারকেশ্বরের বসতি সমস্ত গ্রামটাকে পুলিশ

কর্ডন করে রেখেছে। বিশেষ করে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটি আমাকে পুলিশ খুঁজছে। এবং তার সাথে আশেপাশের বাড়ির শিশু থেকে শুরু করে বুড়ো অবধি সকলকে পুলিশ বেধড়ক প্রহার করে চলেছে। সে কি নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার! জীবনে অমন দেখিনি কখনো।

মা বাবা না ডাকলে সেদিন পুলিশ লকআপে আমার জীবনাবসান হত। ভাগ্যিস সেদিন কোনোরকমে বাড়ির পশ্চাদানুসরণ করে আমি পালিয়ে আসি বর্ধমানের অদূরে শক্তিগড়ে। যেখানেই পুলিশ দেখেছি অমনি নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, এক সময় ট্র্যাফিক কনস্টবলের নজরে পড়তেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই কোথায় যাবে?" বুঝলাম ভাই মানে নিঃসন্দেহ, কোনো ঝামেলা নেই। পরিচয় পেয়ে আমাকে সেদিন ভগবানের ন্যায় সেই একমাত্র ঐ দুঃসময়ে কয়েকদিন নিজেব খরচায় খাইয়ে নিজের আস্তানায় লুকিয়ে রেখে আমার এই জীবনটাকে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। যার করুণা পেয়ে আজ আমি কোথায় চলে গেছি তা ভাবলে এক এক সময় অবাক লাগে।

বি. এস. সি; এম. বি. বি. এস পাশ করার দরুণ ঐ কনস্টবল আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের সব চাইতে বড় সার্জন এবং প্রফেসর ডাঃ হিমাংশু ঘোষের সাথে। উনি ধনী পরিবারের সন্তান হলেও উদারচেতা, করুণার সাগর ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন অতি উদার। আমাকে পেয়ে উনি নিজের জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাকে একটা নতুন জীবনের ঠিকানা দিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে মধুমিতাও এম. বি. বি. এস পাশ করে সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছিল।

বছর চারেক একেবারে গোপনে দিন কাটালাম। শুধু ঐ ভদ্রলোকের কাছ থেকে মেডিক্যাল শিক্ষার নানান বিষয় জেনে।

এইভাবে দিনের পর দিন, চার চারটে বছর জ্ঞানের আরাধনায় নির্বাহ হয়ে গেছে। বাড়িতে শুধু চিঠি পাঠাতাম। সংসারের চিন্তাটা আমাকে করতে হত না বলেই রেহাই পেয়েছিলাম। তা নাহলে সে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াত।

এবার রাজকন্যার কথায় আসা যাক্। আসলে মধুমিতাকে দেখতে এত সুন্দর ছিল যে, ওকে আমি নিজেই রাজকন্যা বানিয়ে দিয়েছিলাম। এক একসময়

ও শুনে হাসত, আবার বেশী করে রাজকন্যা বলে ডাকলে কোনো কোনো সময় ক্ষেপে আগুন হয়ে যেত। যদি বাইরের কারও সামনে বলে ফেলেছি তাহলে তো একেবারে হুম্ ফটাস্।

রাজকন্যার চোখ দুটি ছিল কালো আয়ত, নাক ছিল উন্নত, পাতলা দুটি ঠোঁট, দেহের গড়ন ছিল এক প্রকার আকর্ষণ যুক্ত। এমনকি হাব ভাবে খুবই স্মার্ট ছিল। একেবারে যেন কোনো দেশের রাজকন্যার মত। যতই ওর মধ্যে গাম্ভীর্যতা থাকুক না কেন, খুবই অল্প সময়ে মোমের ন্যায় গলে যেত। যদি কারও দুঃখ দেখত নিজেকে তার দুঃখের ভাগীদার বলে মনে করে সে তার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করত। কখনো যদি কোনো রোগীর ওষুধ কেনার পয়সা না থাকত নিজে তার সব বন্দোবস্ত করত। একপক্ষে ডাক্তারি করে সে যা আয় করত তার সব কিছু সেবায় ব্যয় করে ফেলত।

এক এক সময় তার বাবা ওকে বলতেন, "তুই মা, নিজের দিকে কী একবার তাকাবি? তোর শরীর যে ক্রমশঃ অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!" তবুও ও নিজের দিকে কখনো এতটুকু তাকাবার সময় পেতনা।

আমারও প্র্যাক্‌টিস্‌টা বেশ জমে উঠেছিল। আমি যখন সময় পেতাম তখন ওকে নিয়ে সরাসরি বেড়িয়ে পড়তাম কোথাও বেড়াতে। একদিন ওর এক আত্মীয়ের বাড়ি চন্দননগরে বেড়াতে গেলাম। একটা ছোটো শহর চন্দননগর। হুগলী জেলার এই জায়গাটা বিখ্যাত, বিশেষ করে গঙ্গার ধারের সুদীর্ঘ স্ট্র্যাণ্ড-এর জন্য। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় এখানে এসেছিলেন। সত্যি এক মনোরম জায়গা ফরাসী আমলের এই চন্দননগর। বিশেষ করে যদি কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা এখানের এই স্ট্র্যাণ্ডের জায়গাটি একবার দেখেন তবে নিশ্চয়ই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবেন।

আমরা যখন চন্দননগরে গিয়েছিলাম সবে বসন্ত এসেছে ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশ নিয়ে। মনে পড়ে, দুজনে স্ট্র্যাণ্ডের বেঞ্চে বসে কত বাক্যালাপ করেছিলাম। কখনো গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমাদের হৃদয় স্পন্দন আরও তীব্রতর হয়ে উঠত। কখনো দুজনে দুজনার হাত ধরে অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কত না চুম্বনে দুজনে দুজনকে নিবিড় বন্ধনে আকৃষ্ট করে তুলতাম। সে সময় একবার রাজকন্যা আমাকে বলেছিল, "আমাদের মধ্যে কেউ কোনোদিন নিঃস্ব হবনা। কারণ, তোমার আমার ভালবাসায় দুজনার হৃদয়ে যে সোনালী

প্রাসাদ গড়ে তুলেছি তার রঙ কোনো কিছুতেই মুছে যাবেনা। তাই থেকে আমরা প্রত্যেকে চিরদিন আমাদের পবিত্র ভালবাসার অনুভব করতে পারবো।"

একদিন নিকটবর্তী পাতাল বাড়িতে গিয়ে দুজনে উঠি। আমাদের দুজনার পরিচয় দিতে ঐ বাড়ির পরিজনরা সে এক অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

পরে একবার যখন চন্দননগরে গিয়েছিলাম তখন জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক বিশাল সমারোহে। প্রতিমা বিসর্জনের দিন আলোকসজ্জার সে কি বাহার!• কে কত নতুন মডেলের আলো দিতে পারে, তারই যেন একটা প্রতিযোগিতা চলে প্রতিমা বিদায়ে. ছোট্ট সারা শহর আলোয় আলোয় শুধু আলোরই রোশনাইয়ে যেন চমকিত হয়। আমার রাজকন্যা এইসব দেখতে খুবই ভালবাসত!

সবে আশ্বিন মাস শুরু হয়েছে। দুর্গাদেবীর আগমন অতি শীঘ্র। আমরা রাজকন্যার কাকার চিঠি পেয়ে মেঘালযের রাজধানী 'শিলং' যাবার জন্য সকলেই তৈরি। অবশেষে গন্তব্যস্থলে সবাই পৌঁছে গেলাম। আগে বলে নিই তোমাকে, শিলং যাবার আগে আমাদের বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল' ফিবে এসে আগামী অগ্রহাযণে আমাদের বিয়ে হবে।

শিলং-এ গিয়ে ভাবতে পারিনি যে, অত আনন্দ পাব। জীবনের প্রথম বাধাহীন দুববর্তী স্থানে ভ্রমণ। প্রকৃতি দেবী যেন এই হিমশীতল পাহাড়ী অঞ্চলটাকে নিজের সঞ্চিত সমস্ত রূপ যৌবন দিয়ে এক মনোরম শোভায় শোভিত করে তুলেছে। দুনিযার আব কোনো অঞ্চল বোধ হয় এত ভাগ্য করে সৃষ্টি হয়নি। এই অঞ্চলের চারিদিকে শুধু নানান ফুলের সমারোহ। সব মিলিয়ে এক স্বর্গীয় স্থান!

আমি কোনো কোনোদিন সকালে উঠে কিংবা বিকেলের দিকে ওকে নিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতাম। অনেক সময় আমাদেব খোঁজে ওর কাকা ট্যাক্সি নিয়ে বেড়িয়ে পড়তেন। ওখানে গিয়ে ভীষণ ভাবে দুজনে হৈ-হুল্লোড় করতাম। সুপ্রীম কোর্টের মোক্তম আইনজীবী কাকা মিঃ দেবাংশু ঘোষ মহাশয়ও নিজের সন্তান না থাকার দুঃখ ভুলে আমাদের দুজনের সমস্ত ঝামেলা পরম স্নেহে নিজের স্কন্ধে তুলে নিতেন। ওনার স্ত্রী কখনো রাগ করে বসলে, উনি অনেক সময় আমাদের জন্যে মিথ্যা কথা বলতেও পিছপা হতেন না।

জান শেলী শিলং-এ গিয়েও একটা কবিতা লিখে শোনায় আমাকে—

উল্লাস, অভিলাষ
কিছুই রহিবেনা বন্ধু,
মৃত্যুর সাথে সব—
মুছে যাবে
মিশে যাবে—
মৃত্তিকা গহ্বরে
মনঃ ভাণ্ডারের সকল আশ্বাস
জীবনের যত বিশ্বাস, অবিশ্বাস !

এরপর, আর একদিন আমি ওকে হাসাবার জন্য একটা কবিতা শোনাই—

তব বিনা মম
বাঁচিবার অর্থ নাহি কোনো
বাঁচিতে চাহিনা—
চাহিবনা কখনো
তবে, কেন প্রিয়া তুমি
চাহনা হইতে মোর সম ?

এই কবিতা শুনে রাজকন্যা আনন্দের পরিবর্তে সেদিন দুঃখই পেয়েছিল। তাই ও বলেছিল, "একদিন দেখবে আমাদের মধ্যে কাউকে হয়ত অনেক আগেই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। সেদিন কিন্তু, আমরা যতই চেষ্টা করিনা কেন একে অপরকে কিছুতেই স্নেহ-বন্ধনে ধরে রাখতে পারবো না। সেই কারণে বলছি, যদি ধর আমি এই পৃথিবীতে না থাকি তবে সেদিন কেমন করে তোমার সম হব !"

শিলং ছেড়ে চলে আসায় আমাদের বেশ কিছুদিন দুঃখ থেকে গিয়েছিল। তারপর কাজের নেশায় আমরা দুজনেই তা ভুলে গিয়েছিলাম। "কর্ম এমনই একটা জিনিস যার মধ্যে ডুবে থাকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কথা কেন, স্বর্গবাসী ঠাকুর-দাদার নামটুকুও অনেক সময় দেখবে তুমি মনে করতে পারছ না ."

কার্ত্তিক মাসের সেদিন বারো তারিখ। রাজকন্যার বাবা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। এরপর উনি আমাকে বললেন, বস। আমি চুপ

করে বসে রইলাম। ভাবলাম বোধ হয় উনি আমাকে নতুন কিছু বোঝাবেন। কিন্তু তা নয়। উনি বললেন, "দেখ বিকাশ, মধুমিতার গলব্লাডার অপারেশন হবে। তুমি অতি মাত্রায় চিন্তা করে বসবে বলে আমরা দুজনে এমনকি মধুকেও বারণ করে দিয়েছিলাম যাতে ও তোমাকে কিছু না জানায়।"

এই কথা শুনেতো আমার মাথায় হাত! এ তো মেজর অপারেশন! ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে করবেন এই অপারেশন?" উনি বললেন, "ভাবছি এই কেসটা আমি নিজেই করব। কারণ, মধুর মায়ের ইচ্ছা মেয়ের অপারেশন যেন আমি নিজের হাতেই করি। আমি শুনে বললাম, "সে তো একশবার সত্যি। আপনার উপরে এই মেডিক্যাল কলেজে কেউ নেই।" উনি বললেন, "কিন্তু, কী জান বিকাশ! নিজেদের কেস অনেক সময় ভীষণ ভয়ংকর হয়ে ওঠে!" আমি শুনে বললাম, "স্যার, আপনি ও বিষয়ে কেন চিন্তা করবেন? যা কিছু ভালমন্দ ভাববার, তা ভগবান নিশ্চয়ই ভাববেন।" উনি বললেন, "হ্যাঁ, তা যা বলেছো।"

অপারেশনের আগের দিন রাজকন্যার সাথে আমার জীবনের শেষ কথা হয়েছিল। ও বলেছিল, "আচ্ছা ধর, আমি অপারেশন থিয়েটারের জীবন নাটকে যদি জয়ী না হতে পারি তবে তুমি কাঁদবেনা তো!" আমি উৎসাহের সাথে ওকে বলেছিলাম, "নিজের দুঃখকে কারও বাড়ানো উচিত নয়।" ও বলেছিল, "না. তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে! আমি তা ভাল করে জানি।" একদিন যদি আমার আদর না পাও তবে কত কৈফিয়ত দিতে হয় আমাকে। আর যদি আমার কিছু হয়ে যায়, তবে তুমি কেমন করে নিজেকে ধরে রাখবে। বলেছিলাম শুধু, "বোকা মেয়ের মত অত কিছু ভাবলে চলে। তুমি না একজন এম. বি. বি. এস।" ও বলেছিল, "অসময় হলে অনেক বড় বড় ডাক্তার পর্যন্ত অপারেশন থিয়েটারে ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যায়।"

অপারেশন করতে যাবার আগে রাজকন্যার বাবা বলে গেলেন, "তুমি চিন্তা করনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।" কিন্তু, অতবড় একজন বিশেষজ্ঞ সার্জনের যে মারাত্মক কিছু ভুল হয়ে যাবে তা আমি কখনো ভাবতে পারিনি। যিনি প্রত্যেকের জীবন ফিরিয়ে দেন, সর্বশেষে তিনিই নিজের সন্তানের জীবনাবসানের পথ করে দিলেন!

আর মধু সেদিন থেকে চির জীবনের মত আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল।

এই অপারেশনের পর রাজকন্যার পিতা চাকরি ছেড়ে দেন এবং রাজকন্যার মা সেদিন থেকে আজও মানসিক অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আর আমি ওনাদের অসময়ের সমস্ত ঋণ আজও পরিশোধ করে চলেছি।

কখনো মাঝে মাঝে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে এই কথাগুলোই মনে হয়, 'কাউকে যদি কোনো দিনও হারিয়ে থাকো ফিরে তো আর পাবেনা তাকে, যদি সত্যই তাকে ভালবেসে থাকো তবে তোমার হৃদয়ে তার ভালবাসা বারংবার প্রতিধ্বনিত হবে, মনে এই আশাটুকু রেখে শুধু তার বিশ্বাসেই তুমি চিরদিন বেঁচে থাকো।' তাছাড়া আমরা যেমন আর কোনোদিনও ফিরে যেতে পারবো না আমাদের সবুজ শৈশবে, ঠিক তেমনি আমরা আর কোনোদিনও নতুন করে ফিরে পাবনা আমাদের জীবনে হারানো প্রথম ভালবাসাকে।

কিন্তু! কিন্তু, কি জান শেলি। সব কিছু বুঝেও এই মনটা কিছুতেই বুঝতে চায়না। তাই যখন ওকে মনে পড়ে, কোনো কোনো সময় চলে যাই চন্দননগরের সেইসব জায়গায় যেখানে একদিন নিরালায় কেটেছিল ওর সাথে। কখনো সেই গির্জার ঘণ্টা ধ্বনি শুনে রাজকন্যার মিষ্টি হাসিটা আজও আমার মনে জেগে ওঠে…।

সোমনাথ গড়াই

তিন তলার চিলেকোঠার এই নির্জন ঘরটিতে বসে একটু স্বস্তি বোধ করলেন সোমনাথ মজুমদার। নীচে লোকের ভীড়। কেউ কাঁদছে, কেউ সমবেদনা জানাতে আসছে, কারুর মনে নিছক কৌতুহল। নিজেকে এখন একটু নিজের কাছে একলা পেতে চান সোমনাথবাবু।

সূর্য মাথার ওপরে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। ক্লান্ত কাকগুলো কা'-কা' করতে করতে ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুপুরের এই নির্জনতার মধ্যে কেমন যেন একটা বিষন্নতা কাজ করে।

'সারাটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো—' চিন্তা করতে করতে সোমনাথবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আজ ভোর চারটের সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠতেই কানটা খাড়া করেছিলেন তিনি। ফোনটা বড় ছেলে সুদীপের ঘরে। আর, তারপরই বড় বৌমা ঝুমুরের ডুকরে কেঁদে ওঠা শুনেই বুঝে ফেলেছিলেন— তাঁর জীবনে নবমী নিশির আজই অবসান হল। বুকের ভিতর প্রতিমা বিসর্জনের বাজনা শুনতে পেলেন তিনি।

সোমনাথবাবুর স্ত্রী প্রতিমা দেবী এই দিন সাতেক হল নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। এমনিতে তাঁর রোগ বালাই কমই ছিল। তাই ছেলে-মেয়ে-বৌদের কাছে তিনি বেশ গর্ব করেই বলতেন—"এই বয়সেই তোদের এ-ত রোগ! আমায় ছাখ তো! পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়স হ'তে চললো—ক-বার ডাক্তার বাদ্যির কাছে ছুটোছুটি করতে হয়েছে? সেই কবে তোর বাবার সঙ্গে এই বাড়িতে এসেছি! তারপর শরীরের ওপর দিয়ে, মনের ওপর দিয়ে ক—ত—তো ঝড় ঝাপটা গেছে—তবু তোদের চেহারা, আর, আমার চেহারার কতো তফাৎ ছাখ্!' সত্যিই প্রতিমার চেহারার বাঁধুনি এতই মজবুত ছিলো যে, বোঝাই যেত না তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মা তিনি। মনের ওপর দিয়েও তো ধকল কম যায়নি তাঁর। প্রথম ছেলেটি--যখন তার বয়স এই বছর তিনেক, হঠাৎ কোথা থেকে সর্বনাশা কালাজ্বর এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাকে। আর তাঁর কোলের মেয়েটির রোগ তো ধরতেই পারল না ডাক্তার। বছর খানেকের

ফুটফুটে মেয়েটি কেবল বমি করতে করতেই মায়ের কোল খালি ক'রে দিয়ে চলে গেলো। এত বড় দুটো আঘাত বুকে চেপে সোমনাথবাবু, আর প্রতিমা দেবী এই দীর্ঘ ত্রিশটা বছর পার করেছেন। নিজে ছিলেন সাধারণ পোষ্টমাষ্টার। অভাব অনটন, হাসি-কান্না, মান-অভিমান, আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে দিনগুলো কোনোরকমে পার ক'রে দিয়েছিলেন। তবু তারই মধ্যে যে সুখের দিন আসেনি—তা বলা যায় না। সুদীপ আর রাহুলের চাকরি, লিলির অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে—তাঁদের জীবনের এক-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুদীপের বিয়ে দিয়েও তাঁরা তৃপ্ত। ঝুমুর তাঁদের যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এখন নাতি-নাতনী-ভরা সুখের সংসার তাঁদের। আজ তাঁরা সুখী দম্পতি। জীবন সংগ্রামে জয়ী। ছেলেমেয়েরা সকলেই এখন প্রতিষ্ঠিত। এবার তাঁদের দুজনেরই পরিপূর্ণ অবসর জীবনের প্রান্তে এসে আবার নতুন ক'রে ভাব-ভালবাসার সময়। ঠিক এই সময় হঠাৎ এই ছন্দপতন। ভাবাই যায় না, প্রতিমা আজ আর নেই। সোমনাথবাবু কাপড়ের খুঁটটা দিয়ে চোখ মুছলেন। সেই ভয়াবহ দিনটার কথা মনে পড়ে গেলো—

রাহুল বাড়ি এসেছে ক'দিনের জন্য। রাহুলের বদলির চাকরি। তাই ও এলেই বাড়িতে একটা উৎসবের সুর বেজে ওঠে। সেদিন প্রতিমা লিলিদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। জামাইয়ের পৈত্রিক ব্যবসা। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে সে আটকে পড়েছিল। তবু কথা দিয়েছিল, রাত্রে আসবে। বড় ছেলে সুদীপ ব্যাংকের অফিসার। সেও সেদিন অফিসে হাজার কাজ থাকা সত্ত্বেও মায়ের অনুরোধে অফিসে যায়নি। সেদিন সকাল থেকেই প্রতিমা ভীষণ ব্যস্ত। রান্নাঘরের তদারকি ক'রে তড়িঘড়ি নিজের ঘরে ঢুকলেন। সোমনাথবাবু তখন ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। প্রতিমাদেবীকে ঐভাবে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখে রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলেন না, "নিজের কাজেই এত ব্যস্ত যে, এই বুড়োটার দিকে একটু নজর দেওয়ার কথা মনেই থাকে না!"

প্রতিমা দেবী তখন আলমারি খুলে সোমনাথবাবুর জন্য সদ্য কেনা ফতুয়াটা বের করছিলেন। সোমনাথবাবুর অনুযোগে তিনি একটু মিষ্টি ক'রে হাসলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে মৃদু শাসনের ভঙ্গীতে বললেন, কেমন লোক হে তুমি!

ঘর-ভর্তি লোক আজ! মেয়ে-জামাই আসছে, আজও সেই ছেঁড়া ফতুয়াটা পড়ে বসে আছো?"

চোখ থেকে কাগজ না নামিয়েই সোমনাথবাবু বললেন, 'জানোই তো, চেনা বামুনের পৈতের দরকার লাগে না।'

আলমারিটা বন্ধ করে প্রতিমা দেবী ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। "থাক, ঐ মুখটা যদি তোমার না থাকতো—তবে যে কী হত—" 'নতুন ফতুয়াটা সোমনাথবাবুর সামনে রেখে বললেন, 'নাও, ধরো! ওটা খুলে এই নতুনটা গায়ে চাপিয়ে নাও।'

'ওটা আলমারিতেই তুলে রাখো।' সোমনাথবাবু গম্ভীর।

প্রতিমাদেবী দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন—ঘুরে দাঁড়ালেন। ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললেন—"কেন? আজকাল বুঝি কম দামের জিনিসে মন ভরে না?—"

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে এবার সোমনাথবাবু কৌতুক ক'রে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়, হঠাৎ সোমনাথবাবু কিছু বোঝার আগেই প্রতিমা দেবীর পা-টা কেমন টলে যায়। তিনি ছুটে ধরতে যাবার আগেই প্রতিমা দেবী প'ড়ে যান। শব্দ শুনে বাড়ির অন্যান্য সকলেই ছুটে আসে। তারপর ডাক্তার —নার্সিংহোম—তারপর সব শেষ!

নার্সিংহোম থেকে প্রতিমা আজ শেষবারের মত বাড়িতে আসবে ব'লে সোমনাথ মজুমদার নিজে আলমারি খুলে সেই নতুন ফতুয়াটা বের ক'রে গায়ে দিয়েছেন।

"বাবা, আপনি এখানে? এদিকে সবাই আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে, নীচে চলুন!"

চমকে উঠে সোমনাথবাবু তাকিয়ে দেখলেন—ঝুমুর। চশমাটা চোখে পড়ে নিয়ে সোমনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন—'চলো'।

পা-টা যেন একটু বেসামাল লাগছে। ঝুমুর শ্বশুরের হাতটা ধরে আস্তে আস্তে তাকে নীচে নামিয়ে আনলো।

নিচের বারান্দায় বোম্বাই খাটের ওপর নরম গদীতে প্রতিমা দেবী শুয়ে আছেন। ঠোঁটে একটুকরো হাসি, মুখখানা প্রশান্ত, চোখদুটি ঈষৎ খোলা।

কপালে চন্দন, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে লাল পাড় গরদ, পায়ে আলতা, ফুলে ফুলে সারা শরীর আচ্ছাদিত। সুন্দর ধূপের গন্ধে চারদিক ম'ম' করছে। লিলি মায়েব পায়ের কাছে উপুড হয়ে পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ছেলেরা প্রস্তুত মাকে খাটে তোলার জন্য। কে যেন প্রতিমা দেবীর গায়ের ওপর এক শিশি আতর এনে ঢেলে দিলো। জামাই ম্যাটাডোর আনতে গেছে। সোমনাথ বাবুর কানে এলো কে যেন বলছে—"বড ভাগ্যবতী ছিলো গো! স্বামী, ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী সব সাজিয়ে রেখে কেমন ড্যাং-ডেঙিয়ে সগ্যে চলে গ্যালো গো!"

সোমনাথবাবু আসতে প্রতিমার চারদিকের গোল হয়ে থাকা ভীড় একটু পাতলা হল। বৌমা তাঁর হাতে 'নোয়া' খুলে দিলো। তিনি পরম যত্নে প্রতিমার হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল, আরেক দিনের কথা!

সেদিনের প্রতিমার নরম উষ্ণ হাতটাকে তিনি ঠিক এইভাবেই তুলে নিয়ে-ছিলেন সেদিন। কানের কাছে ভেসে এলো পুরোহিতের সেই মন্ত্রোচ্চারণ—'যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম—'

আস্তে আস্তে লোহাটি পরিয়ে দিলেন।

বৌমা এবার একটা সিঁদুরের প্যাকেট এগিয়ে দিলো। সোমনাথবাবু ধীরে ধীরে প্যাকেটটা খুলে প্রতিমার সিঁথিতে পরিয়ে দিলেন।

—'সেদিন কিন্তু তোমাকে গোধূলি-লগ্নে পরিয়ে ছিলাম।' সোমনাথবাবু বিড়বিড় করে বললেন। তারপর মাথায় হাত দিয়ে গভীর স্নেহে মুখ নামিয়ে বললেন, 'এই সাতদিন বড়ো কষ্ট পেয়েছো প্রতিমা! এখন আরামে ঘুমোও।'

পিছন থেকে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন তিনি। সধবা মহিলারা হুমড়ি খেয়ে পডছে প্রতিমা দেবীর সিঁথির একটু সিঁদুর ছোঁবে বলে।

ভীড় কাটিয়ে কোনো মতে তিনি গেটের মুখে এসে দাঁড়ালেন। সুদীপের মেয়ে টুস্‌কি, আব লিলির ছেলে খোকন সেখানে খেলা করছিলো। চার-পাঁচ বছরের ছেলে-মেয়ে দুটো বুঝতেই পারছে না— কি তারা হারালো!

'Sweet my child, I live for thee'—ক্লান্তভাবে উচ্চারণ করলেন সোমনাথবাবু—মৃত সৈনিকটির বিধবা পত্নী তার ছেলেটার জন্য বাঁচতে

চেয়েছিলো। কিন্তু আমি? আমি কাকে অবলম্বন করে বাঁচবো প্রতিমা? চশমাটা চোখ থেকে খুলে চোখটা মুছে নিলেন।

দাদু কাঁদছো কেন?

দাদু, দিদাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

তোমাদের দিদাকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছি ভাই!

জলের মধ্যে দিদাকে ধপাস্ করে ফেলে দেবে—না দাদু? আমি তো বাণীর সঙ্গে গিয়ে এবার ঠাকুর বিসর্জন দেখে এসেছি!

পাকা গিন্নীর মতো মুখ করে টুস্‌কি বলল, তাতে কি হয়েছে দাদু? আমরা তো আছি। তুমি কেঁদো না—

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন সোমনাথবাবু। তিনি জানেন, এরা এদের পড়াশুনা, নাচ-গান, সেতার, প্যারেড—এইসব হাজার কাজের বাঁধনে বাঁধা। এদের সময় কোথায় তাঁর পিছনে সময় নষ্ট করার?

ম্যাটাডোর এসে দাঁড়ালো। আর্ত কান্না, গুমোট আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে দুই ছেলে, জামাই, এবং আরো কয়েকজন শ্মশান যাত্রী প্রতিমাকে কাঁধে তুলে 'বল হরি, হরিবোল' বলে পয়সা, খই ছড়াতে ছড়াতে ম্যাটাডোরে এনে তুললো। খাঁ-খাঁ করছে মধ্যাহ্ন গগনের রোদ। প্রতিমা রোদ একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। কখনো সখনো দরকারে রোদের মধ্যে বেরোতে হ'লে মাথা ধরতো। আজ তার সুন্দর মুখখানা রোদে ঝলসে যাচ্ছে। সোমনাথবাবু ছুটে ঘরে ঢুকে গেলেন। হাতে করে নিয়ে এলেন তাঁর বড়ো কালো ছাতাটা। তারপর, ম্যাটাডোরে উঠে বসলেন।

ম্যাটাডোর ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। সকলে বিস্ময়ে দেখলো, সোমনাথ মজুমদার তাঁর ছাতাটা প্রতিমার মাথার কাছে খুলে বসে আছেন। কাঠফাটা রোদে তাঁর নিজের মাথাটা যে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

সুদীপ একবার বলতে চেষ্টা করলো, বাবা, ছাতাটা তোমার মাথাতেও একটু দাও।

ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, রোদে চলাফেরা করা আমার অভ্যেস আছে।

নীতা মিত্র

ডালিয়া শোবার ঘরে গিয়ে আলো না জ্বালিয়েই একটা সাদা চাদর দেহের অর্ধেক পর্যন্ত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। যা' কিছু বলার ছিল সব-ই আগের দিন বলা হয়ে গেছে। এখন দু'জনেই নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চিন্তায় আচ্ছন্ন!

রাত্রি বেলা খাবার খেতে-খেতে ডালিয়া সুকান্তকে প্রশ্ন করেছিল, "সত্যি, তুমি কী যাচ্ছ?'

বিরক্তির সঙ্গে মুখে খাবার নিয়েই সুকান্ত উত্তর দিয়েছিল,—'হ্যাঁ'। কোনো আপত্তি আছে?

ডালিয়া বলেছিল,—'না, আমি শুধু তোমার ঐ জায়গায় যাওয়াটা…!'

হাতে জলের গ্লাসটা ধরে সুকান্ত প্রশ্ন ক'রে ছিল "কোথায় যাচ্ছি, তুমি জানো?"

—'কই আমায় তো বলোনি?'

—না, বলিনি? মানে, তুমি মনে করছো আমি পাগল? মাতাল? তবে কী?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডালিয়া উত্তর দিল: 'আমিই বোধ হয় আন্দাজ করে নিয়েছি।'

—'মানে, তুমি আন্দাজ করে সব-ই বলতে পারো?'

—'Please; তুমি যেওনা?'

—'আচ্ছা, না হয় ধরে নেওয়া যাক্…'

কী ধরে নিতে হবে সে সম্বন্ধে কোনো রকম ধারণা না করেই সুকান্ত প্রশ্ন করেছিল: ধরা যাক্—

—আমি সত্যিই সে জায়গায় যাচ্ছি! কী হয়েছে তাতে? দু'জনেই চলো যাই!'

—'যদি তাই হয়, তুমি যাও গে?'

—'না,…'

ভয় পেয়ে তাকে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিল 'ডালিয়া।' আত্মরক্ষার জন্যই সে চাদরে মুখ ঢেকে বলেছিল, 'তুমি একাই যাও, যদি যাবে ঠিক ক'রে থাকো।'

—'আ-মা-কে কেন? ··যাও না যদি তোমার বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ড থাকে।, জানিতো, গত, সাতটি বছর তুমি আমাকে নিয়ে কত জায়গাতেই না বেড়িয়ে এসেছ। আজ একা-একা যেতে কী ভয় জাগছে?'

—মৃদু কণ্ঠস্বরে সুকান্ত উত্তর দিয়েছিল, 'তবে একাই যাবো—।'

সুকান্তর ক্রোধের চেয়ে বিস্ময়ের ভাবটাই বেশি ফুটে উঠেছিল কথোপকথনের মধ্যে। মনের চাঞ্চল্যটুকু এতক্ষণে তার শান্ত হয়েছে। বর্ষার রাত। অনবরত ঝড় হওয়ার ফলে বাংলোর আশেপাশের গাছের মাথাগুলো ফাঁকা হয়ে গেছে বটে কিন্তু তার মনের আশা ফাঁক হয়েছে বলা যায় না।

থেমে গেছে বাইরের ঝোড়ো বাতাস আর বৃষ্টি! চেয়ারে বসে সুকান্ত আরেকটা সিগারেট বের ক'রে ধরালো। কিন্তু, হঠাৎ সিদ্ধান্তটা বদলে, সে সিগারেটটা ঐ জলন্ত অবস্থাতেই টেবিলের উপর রেখে দিল।

আজ থেকে তাদের বিবাহিত জীবন সাত বছর হয়ে গেল। পরস্পরের সঙ্গে মিল খাইয়ে নেবার যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। এবং সেটার জন্যেই সুকান্ত এবারও নিজের অজান্তে ধরা পড়েছে। মনে হতে পারে ডালিয়াই তার সবচেয়ে কাছের মানুষ! কিন্তু তবুও তার মধ্যে যেন একটা প্রহেলিকা রয়েছে। যতদিন যাচ্ছে, রহস্যটা ততই আরও বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

সুকান্ত চেয়ারে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু, চেতনার একটা সদা জাগ্রত ভগ্নাংশ তাকে সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দিচ্ছে। তারই উপরে দুর্ভাগের যে দুর্বিসহ বোঝা নেমে এসেছে এইটুকুই ভাষা!! তবু কেন?······

সেই অবিস্মরণীয় দিনটির সকালবেলায় সুকান্ত তার স্বপ্নময় বিহ্বলতা থেকে অনিচ্ছার সাথে ফিরে আসতে চেষ্টা করেছিল, মনকে কঠিন করে তোলার বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু, ঠিক সেই মুহূর্তে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—অনেক দূর থেকে বাতাসের মাধ্যমে ভেসে আসছে। আর সে একটা ঐকান্তিক প্রত্যাশায় আড়ষ্ট হয়ে এটা যে সত্যি হতে পারে তা বিশ্বাস করার আশঙ্কায় উপলব্ধি করল যে, সত্যিই এই বাস্তবতার মধ্যেই তার সাথে কথা বলছে,

চলে যাবো কেন? আমি আছি, আমি থাকবো……চিরতরে তোমারই থাকবো, শান্ত হও…… শান্ত হও; Please · ··· ডালিয়া।

নিজের হৃদয়ের মধ্যে গভীর কোনো এক জায়গায় ডালিয়া যেন এটার জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু, তবু বার বার সে নিজের মুখের দিকে তাকিয়েছে তার সুপরিচিত আর বিস্মৃত আদল গুলোর প্রতিমূর্তি খুঁজে বের করবার চেষ্টায়। কিন্তু, তার ফলে সে শুধু এ ধরনের প্রয়াসের নিরর্থকতা সম্বন্ধে আরও বেশি করে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

কিভাবে যেন ডালিয়া শান্ত হয়ে গেছে কোনো প্রশ্ন না করে হাত দু'খানা তার নরম ঠোঁটের কাছে এনে মৃদু সন্তর্পনের স্পর্শে চুম্বন করতে লাগল। ঠিক যেমন ভাবে এর আগের তার কল্পনার জগতে কোটি কোটি বার মৃদু স্পর্শে চুম্বন করেছে। সুকান্ত তার কাছেই রয়েছে। শুধু সেটাই পূর্ণ সুখী হবার সুরের বন্ধন। আর প্রেম পূর্ণ ডালিয়ার সুখটুকু কয়েক সেকেণ্ডের জন্য পরিপূর্ণ করে তোলার একটাই সুর আর তার ভাষা, 'সু-কা-ন্ত…… !'

বিবাহিত জীবন, সুখের জীবন! তাদের এই জীবনকে সকলে দেখে বেশ সুন্দর বলে মনে করে।

সকলের ধারণা যে বিবাহিত একটি শপথ। 'বিবাহিত জীবন হল ভালবাসার গৌরব!' কত না সুখের; কত না আনন্দের উল্লাসের এ তরণী। আর তার উপর শোভা পায় একটি ফুটন্ত রক্ত গোলাপ! তবে তো বিশ্ব প্রকৃতির মমতায় স্নেহের চেয়ে আরও, আরও বেশি দামী! কিন্তু, 'কে জানে দুটি আত্মার গোপনে রচিত হচ্ছে এক অদ্ভুত পূর্ণ বিদ্রোহী থিয়েটার?'

তাদের প্রতি বিচক্ষণ মনোযোগ আর, তাদের চিন্তা ভাবনার নানা নিদর্শন দয়া ও করুণার অস্তিত্ব অনুভব কে করেছে?

সত্যিকারের প্রেম আর ভালোবাসা যে ডালিয়ার মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায়; সুকান্ত তার সমস্ত প্রয়াস নিজের জীবন দেওয়ালে ঠোকার মতই বারবার ব্যর্থ হয়েছে…।

বিলেশ্বর গড়াই

নবজাতক

ক্রিড়···রিং···, ক্রিড়··· রিং···ং···। দোতলায় সদর দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠল, বার কয়েক। ভেতর থেকে কোনো উত্তর আসে না, ফের কলিং বেলের সুইচটায় টিপ দেয় মৃন্ময়। বেলটা বাজতে থাকে ক্রিড়···রিং···।

"কে···?" ভেতর থেকে সোমার গলার আওয়াজ আসে। দরজা খুলে দেয় সোমা।

"ওমা তুমি? এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?"

হ্যাঁ, মৃন্ময় ভেতরে ঢোকে, একটু যেন ক্লান্ত, অবসন্ন মনে হয় তাকে। কিছুটা উদাসীন। ঘরে ঢুকেই ফুলস্পিডে পাখা চালিয়ে দেয়, প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মের এই তপ্ত বিকেলেও বাইরের বাতাস একেবারে বন্ধ।

এখন কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বাজে। ঘড়িতে তারই ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং। হাতের একটা সাদা প্যাকেট টেবিলের উপর রাখে মৃন্ময়। ওতে কিছু ফুল ও রজনীগন্ধার মালা আছে। আসার পথে কিনে এনেছে সে।

সোমা এসে সামনের চেয়ারে বসে। বলে, "কি হল বসলে যে? হাত মুখ ধুয়ে নাও। চা বসাচ্ছি, বিকেল তো হয়ে এল।"

"যাচ্ছি, ওরা কোথায়? পিংকু, টুকু?"

"স্কুল থেকে ফিরে পিংকু ক্লাব লাইব্রেরীতে গেল, টুকু স্কুলে যায়নি। ও ঘরে ঘুমুচ্ছে। তুমি কি খাবে? ওমলেট্ করে দিই?"

"না থাক, খিদে নেই, অফিসে বেশ খাওয়া হয়েছে অবেলায়। শুধু চা-ই কর।"

সোমা কিচেনে যায়, ঠায় বসে থাকে মৃণ্ময়। কিছুই ভাল লাগছে না। এদিনটাকে সে আগে খেয়াল করেনি। তাহলে অফিসে যেত না আজ। পরে মনে পড়ায় একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আজ মায়ের মৃত্যুদিন, ঠিক দু বছর আগে এই দিনটাতে মা সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বড় বেশী করে মনে পড়ছে তার কথা। একটু নির্জনতা চায় মৃন্ময়। সোমাকে অফিসে থাকার আগে ওর মামার বাড়ী ওকে নিয়ে যাবে বলেছিল। ওর

মাসতুতো ভাই গৌতম আজ বাড়ী আসছে। বিকেলের ফ্লাইটে। বড় চাকরী করে। দিল্লীতে অফিস কোয়ার্টারে থাকে। ওখানকারই এক প্রবাসী বাঙালীকে বিয়ে করেছে। রেজিষ্ট্রি বিয়ে। কোন আপত্তি তোলেনি বাড়ী থেকে। বোধ হয় বড় চাকরীর দৌলতে। বৌ নিয়ে আজই প্রথম বাড়ীতে আসছে, সোমাকেও জানিয়েছে চিঠিতে। ভাই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সোমা। ওর নিজের গাড়ী আছে। দিল্লীতে ফ্ল্যাট কিনছে। সোসাইটিতে চলাফেরা, স্ট্যাটাস সম্পর্কে সোমা প্রায়ই গর্ব করে বলে। মৃণ্ময়ের অসহ্য মনে হয়। তবু শুনতে হয়।

মৃণ্ময় উঠে পড়ে। বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। শরীরটা একটু চাঙ্গা মনে হয়। রজনীগন্ধার ছটা মালা, কিছু বেলফুল, গোলাপ, সেগুলো প্যাকেট থেকে বের করে। জল ছিটিয়ে দেয় ওগুলোতে। টুকু এতক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্লাস ফোরে পড়ে। বাবাকে জিজ্ঞাসু ভাবে বলে "এত ফুল দিয়ে কি হবে বাপি ?

"ঠাকুমার ফটোতে দেব, দেখছো না বেল, গোলাপ ? সব ঠাকুমার জন্য"

কেন বাপি, আজ ঠাকুমার ক ?"

মৃণ্ময় একটু সামনের দিকে তাকায়। সোমা কিচেনে কাজ করছে। সোমার কি মনে আছে মা এ দিন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ? কি জানি, হয়তো নেই। সারাদিনের কাজের ফাঁকে মনে থাকার কথাও নয়। মায়ের সাথে কোনদিনই মানিয়ে নিতে পারেনি সোমা। সেই কারণেই এখানে, এই অফিসের কোয়ার্টারে উঠে আসা। সোমার জোরাজুরিতেই, মাকে কেন জানি সোমা সহ্য করতে পারত না, হয়তো ওর ভেতর এ্যাডজাস্টমেণ্টের ক্ষমতাটা কম, অনেক ভাবে, অনেকবার মা চেষ্টা করেছে, বৌমাকে তোয়াজও করেছে। অবশ্য মায়ের কোনো সম্পদ, টাকাকড়ি ছিলো না। বাবা মারা যাবার আগে কিছুই বিশেষ রেখে যান নি। দরাজ হাতে যা আয় করতেন, খরচও করেছেন, বাবা বলতেন, "অর্থ ই অনর্থের মূল। ওকে যত তাড়াতাড়ি বিদেয় করা যায় ততই মঙ্গল।" বাবা সংসারের ঘোরপ্যাচ বোঝেন নি, বোঝেননি যে এর ফল একদিন মাকেও পোয়াতে হবে বাবা মারা গেছেন আট—সাড়ে আট বছর হয়ে গেল, বা তারও বেশী, মাকে একা সংসারে ফেলে রেখেই। একমাত্র মেয়ে শেফালীর

বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অনেককিছু আশা করে একমাত্র ছেলে মৃণ্ময়ের বিয়ে দিলেন মা। অনেক দেখে শুনে, অনেক খোঁজ খবর করে। মায়েরই কোন এক জ্ঞাতি সম্পর্কটা করেছিল।

মৃণ্ময় তখন সদ্য দু-এক বছর হল চাকরিটা পেয়েছে। পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেণ্টে, ভাল চাকরি। তাই অবস্থাপন্ন বাপের একমাত্র মেয়েকে ঘরের বৌ করে এনে সুখ পেতে চেয়েছিলেন মা। মৃণ্ময়ও তখন বাবাকে হারিয়ে ভীষণ মা ঘেঁষা। মাকে ভালোবাসতো খুব। শেফালী তাই মাঝে মাঝেই বেড়াতে এলে বলত, "বিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিয়ে মাকে একার করে নিচ্ছিস দা-ভাই? সব ভালোবাসা মাকেই দিলে বৌকে কি দিয়ে ভালো বাসবি, ঝগড়া করে?"

বৌ এর কথায় লজ্জা পেত মৃণ্ময়। তবু বলত, "মায়ের জন্য যে ভালোবাসার আলাদা কোটা আছে, তা শুধু মায়ের জন্যই। তোর বরকে তুই ভালোবাসিস না?"

শেফালী লজ্জা পেত। মা মিটিমিটি হাসত মনে মনে। আর হেসে বলত, "ছেলেকে জব্দ করব এক জাঁদরেল বৌ এনে।" ছেলেকে ভালভাবে পাত্রীস্থ করার বাসনা তার অনেকদিনের। কিন্তু সোমা কেন জানিনা অ্যাডজাস্ট করতে পারলো না। সব বিষয়েই মায়ের খুঁত ধরবার জন্য উঠে পড়ে লাগত। মৃণ্ময় বুঝতে পারত মায়ের কাছ থেকে সেও অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। সব বুঝেও সোমার উপর চড়াও হতে পারেনি সেদিন। কখন জানি আস্তে আস্তে এক ভালোবাসার সম্পর্কের জাল গড়ে উঠেছে সোমার সঙ্গে। সারাজীবন মার সুখে দুঃখে সহায় হতে হবে, মাকে কেন্দ্রবিন্দু করে দুজনের মাঝে অনাগত ভবিষ্যত জন্ম নেবে, কেন জানি তার প্রতি কঠোর হতে পারেনি মৃণ্ময়। এখন মনে হয়, হয়তো তখন কঠোর হলেই ভাল হত। পক্ষপাতিত্ব করে সোমাকে নিয়ে উঠে এসেছিল অফিসের এই কোয়ার্টারে। পক্ষপাত দুষ্ট হয়েই খানিকটা। মা যেন হঠাৎই হতবাক হয়ে গেছিলেন, ঘটনার আকস্মিকতায় চুপও হয়ে গেছিলেন, অনেক আলাদা, অনেক স্বতন্ত্র।

কেন জানি আজ বারবার বর্তমান থেকে মাঝেমাঝেই অনেক দূরে সরে যাচ্ছে মৃণ্ময়, কখনও এরকম হয় না. অবশ্য অবকাশই বা কোথায়। অনেক ঝামেলা,

সাংসারিক সমস্যা, কিন্তু আজ ?

সম্বিৎ ফিরে পায় মৃণ্ময় মেয়ের কথায়।

"ওদিকে তখন থেকে তাকিয়ে কি দেখছ বাপি ? কোয়ার্টারের ওপাশের কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলগুলো ? ইস্ কি সুন্দর। দাদাকে কত বলি ওর একটা ডাল এনে দিতে, শুধু বলে পরে দেব, পরে দেব, বাপি, ও বাপি, আজ ঠাকুমার কি ? জন্মদিন ? কেউ আসবে না ?"

"না মা, কেউ আসবে না। আজ তোমার ঠাকুমা আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, এদিনে আনন্দ করতে নেই মা,' মৃণ্ময় চুপ করে যায়, টুকুও গুরুত্ব বুঝে আর কথা বলে না, সোমা কিচেন থেকে একটু চিৎকার করে বলে, "ও, তাই বুঝি এত ফুল আনার ঘটা ? তাইতো ভাবি আজ এমন চুপচাপ, কবি কবি, কথার মাঝে কথা হারিয়ে যাওয়া !" হাত মুছতে মুছতে সোমা বারান্দায় চলে আসে।

"বলি একটু পরেই বেরুতে হবে সে খেয়াল আছে তো ? নাকি তাও ভুলে বসে আছ ? এতক্ষণে গৌতম হয়তো এসে পড়েছে, ফ্লাইট থেকে নেবেই তো ট্যাক্সিতে বাড়ী, কতই বা সময় লাগবে ?" একটু থেমে বলে, "জানতো ওর বউও নাকি ভীষণ হুল্লোড়ে, স্মার্ট, দিল্লির মেয়ে তো, তা হবে না ? আমাদের মত ওর তো আর কালি মেখে হাড়ি ঠেলতে হয় না।"

মৃণ্ময়ের এসব পরশ্রী কাতরতা পছন্দ হয় না। চুপ করে থাকে, "ছেলেট এখনও ফিরল না, ও না এলে টুকু একা থাকবে কি করে ? কি যে করি না" সোমা কিচেনে চলে যায়।

মৃণ্ময় ফুলগুলো বসবার ঘরে মায়ের বাঁধানো ছবির পাশে রাখে। ফটোতে মালাগুলো পরিয়ে দেয়। ফুলের সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। ধূপও জেলে দেয়, টুকু এসে আবার বাবার পাশে দাঁড়ায়। বাবার সাথে ঠাকুমাকে প্রণাম করে হাত জোড় করে।

মায়ের মুখটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড়ই ম্রিয়মান নির্বিবাদী, অসহায়। মায়ের ওই চোখ যেন অনেক কথাই বুঝতে পারে মৃণ্ময়, কত অপমান অশ্রদ্ধার পরেও মা অবিচল ছিলেন। বোধহয় পৃথিবীর সমস্ত মায়েরাই এই রকম, বিপথগামী সন্তানের আশাতীত আচরণের পরেও যীশুর মত বলতে পারে "ক্ষমা কোরো ওদের পথ দেখাও।"

আমরণ মা শেফালীর কাছেই ছিল। শেফালীর বর প্রিয়ব্রত অমায়িক ভদ্রলোক। কখনও মাকে অসম্মান করেনি। বরং মায়ের উপর তার ভক্তি একটু বাড়াবাড়িই দেখাত বাইরে থেকে। মা কখনও ওদের কাছে গলগ্রহ হয়ে ওঠেনি। মাকে একবার মৃণ্ময় কাছে রাখবার চেষ্টা করেছিল। রেখেছিলও, সোমা মানাতে পারেনি। মৃণ্ময়ই মাকে আবার শেফালীর কাছে রেখে এসেছিল। টুকু, পিংকু তখন খুব ছোট। ঠাকুমাকে একেবারেই ছাড়তে চাইত না। সোমা এই ন্যাওটা ভাব পছন্দ করত না, গাছের মূল শেকড়টি যেমন পচে গেলে গাছ বাঁচে না, সোমাও মায়ের বিচ্ছেদ তেমনই অনেক আগেই ঘটে গিয়েছিল। মাকে ফিরে যেতে হয়েছিল ফের শেফালীর কাছেই। পিংকু, টুকুর নিশ্চিদ্র ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেই। মায়ের জন্য অনেক কিছুই করতে ইচ্ছা করত। কিন্তু খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মত বহির্জগত থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত মৃন্ময় কিছুই করতে পারেনি। মনে পড়ে চিতায় শোয়ানো মায়ের পাণ্ডুর দেহটা যখন চিতাকাঠের আগুনে দাউ দাউ জ্বলে উঠেছিল, শেফালী ভেঙে পড়েছিল কান্নায়। মৃন্ময়েরও খুব কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। তবু বোনকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "মা কি কারো চিরকাল থাকে রে? পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে একদিন সবাইকেই চলে যেতে হয়, এই তো নিয়ম, শান্ত হ লক্ষ্মীটি, চোখ মোছ" কিন্তু আজ কেন নিজেকে শান্ত রাখা যাচ্ছে না? কেন বুকের ভেতরটা অসহনীয় ব্যথায় বারবার মোচড় দিয়ে উঠছে? গলা ছেড়ে কাঁদছে ইচ্ছা করছে মৃন্ময়ের। বুক ফেটে যাচ্ছে কান্নায়।

সোমার চিৎকার আসে কিচেন থেকে।

কি হলো তোমার? চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, ঘরে একবার ঢুকলে তো ঢুকলেই। বলি বেলা কত হলো সে খেয়াল আছে? পাঁচটা বাজে। পিংকু চলে এসেছে। কিন্তু মৃন্ময় ওখানে যেতে পারবে না। একটু নির্জনতা চাই। নিরালায় স্মৃতির পর্দা টেনে আনবে আজ একে একে। পিংকু এসে বলে গেল বাবাকে, মা ডাকছে।

"হ্যাঁ যাই" বলে মৃন্ময় মায়ের আবক্ষ ফ্রেমে বাঁধানো ছবির সামনে এসে হাত জোড় করে আর একবার প্রণাম করে। মায়ের বিয়ের অব্যবহিত পরেই এ ছবি তোলা। মায়ের মুখেই মৃন্ময় শুনেছে, বাবা নাকি প্রথমবারই মাকে দেখে দাদু-ঠাকুমার কাছে এসে বিয়ের মত দিয়েছিলেন। পরে দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড

ভাব হয়ে গিয়েছিল। বাবা অফিসের কাজে প্রায়ই দূরে যেতেন। কিন্তু যত রাতই হোক বাড়ী ফিরেছেন। কখনও মাকে ছেড়ে একরাতও বাইরে থাকেননি কোথাও। সেই বাবার সাথে শেষ জীবনে মায়ের বনিবনা হত না একেবারেই। প্রায়ই ঝগড়া বাঁধত। এটা ওটা নিয়ে খিটিমিটি লেগেই থাকত। রেগে গেলে বাবা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। দুজনেই দুজনার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মা প্রায়ই চুপচাপ বসে চোখ মুছতেন। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন স্বামী যে কোন নারীর কাছে একমাত্র অবলম্বন। বাবার জীবন তখন রোগব্যাধির আক্রমণে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। তারপর বাবাও একদিন চলে গেলেন। শেফালী তখন বি এ. পড়ে। বিয়ে হয়নি। মৃন্ময় সদ্য গ্রাজুয়েট। দু এক জায়গায় চাকরীর দরখাস্ত করেছে। অল্প যা বিধবা-পেনসন মা পেতেন তাতেই সংসার যা হোক করে চলত। একদিন বাবারই এক অন্তরঙ্গ বন্ধু জীবন কাকু তাদের খোঁজ খবর নিতে এলেন। তিনিই খবরটা দিলেন বাবার অফিসে কিছু লোক নিচ্ছে। মৃন্ময়কে ডেকে বললেন, তুমি দরখাস্ত করে দাও। আমি দেখছি কি করা যায়। অনিল বাবুর ছেলে হিসাবে তোমাকে হয়তো কিছু ফেসিলিটি দেবে ওরা। তারপর মৃন্ময় আর দেরী করেনি, দরখাস্ত করেছিল। চাকরীটা হয়ে গেল। জীবন কাকুরই খানিকটা তদ্বিরে। ভদ্রলোক নিঃস্বার্থ ভাবে চেষ্টা ত করেছিলেন। আজও তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে মৃন্ময়। তিনিও কয়েক বছর হল হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।

"কি হলো রে বাবা! মায়ের ধ্যানে এবেবারে পাথর হয়ে গেলে নাকি? খাবার দিয়েছ, তাড়াতাড়ি এসো," কিচেন থেকে সোমার চিৎকার আসে। আজ মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে পড়ছে মৃন্ময়। আর দেরী না করে কিচেনে যায় চায়ের সাথে সাবুর চাকা ভাজা টুকু পিংকু মুচমুচ করে খাচ্ছে। ভাগে কম হয়ে গেছে বলে দুজনের মধ্যে বচসা চলছিল এতক্ষণ। দুজনেই ছেলেমানুষ. মিলও খুব দুজনের মধ্যে। বাবাকে ভীষণ ভয় করে ওরা। কারণ মৃন্ময় স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির। মৃন্ময় যেতেই সব চুপচাপ। একটা কাঠের পিঁড়ি নিয়ে বসে মৃন্ময়। সোম চা, মুড়ি, সাবু ভাজা এগিয়ে দেয়। কিন্তু মৃন্ময় ভাজাগুলো ছেলে-মেয়ের বাটিতে তুলে দেয়; "এসব আবার দিলে কেন, বললাম তো কিছুই খেতে ভালো লাগছে না, খিদে নেই", বলে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

"কিছুই খাবে না? সেকি! মাতৃভক্তিতে একেবারে খিদেও চলে গেছে?" সোমার মুখে তির্যক হাসি খেলে যায়, "বাব্বা! মা যেন তোমারই শুধু মরেছে, অনেকেই মা মরে, তারা এমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী হয় না।"

"আমাকে ওই অনেকের মধ্যে নাই বা ফেললে। সবাই সমান হয় না।"

মৃন্ময়ের গলার স্বর যেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে যায়। একটু চড়া,। "তা ঠিক, তবে বাপু তোমার মত এত দেখিনি, মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ হলেও তো আর সে ফিরে আসবে না?"

"সোমা গুরুজনদেব সম্পর্কে একটু সংযত হয়ে কথা বলতে চেষ্টা কর।"

"বাব্বা! বুকে যেন তীর বিঁধল মনে হচ্ছে?" সোমার মুখে বিদ্রূপের চমক খেলে যায়, ব্যঙ্গেব হাসি।

সোমা, এটা জেন, তোমাকে বিযে করলে বামপ্রসাদ হওয়া যায় না। তোমাব বোজকাব কথাব তীরে অন্য তীর আর বুকে বিঁধবে কোথায়?

কি, কি বললে? আমায় তুমি খোঁটা দিলে? বলি অতই যদি রামপ্রসাদ হবার সখ ছিল তো মবতে বিয়ে করতে কে দিব্যি দিয়েছিল? চেষ্টা করলে বাবা অনেক পযসাওয়ালা জামাই ধরে আনতে পাবতেন। আর তুমি আমায় অপমান কবলে? এত বড কথা বললে? সোমা যেন ফোঁস করে জ্বলে ওঠে। টুকু, পিংকু ওঘরে চলে গেছে। বোধ হয় ভয় পেয়েই। বাবা মাকে কখনো এমন ভাবে কথা বলতে দেখেনি ওরা। হয়তো সেই কারণেই প্রমাদ গুনে ওঘরে চলে গেছে।

সোমা কষ্ট করলে আর চেষ্টা করলে অনেক বড় লোক হওয়া যায়, কিন্তু মনটাকে তাতে বড় করা যায় না। পযসা দিয়ে সব কিনলেও মানুষের মন কেনা যায় না। সেই মনটাকে আনতে চেষ্টা করো। চিৎকার কোরো না। ওতে ভদ্রতার পরিচয় হয় না।

থাক অনেক হয়েছে। ভদ্র-অভদ্র আমাকে বুঝিও না। ছেলেমেয়েদের সামনে তুমি আমায় অপমান করলে!

সোমা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। মৃন্ময় আর কথা বলে না, একটু নরম হয়ে বলে, এতে অপমানের কি দেখলে? সব সময় এত মান সম্মানের কথা

ভাবলে তা হারাবার ভয় থাকে। একটু চিন্তা করো নিজেই বুঝতে পারবে, যা বুঝতে আগে চেষ্টা করোনি কখনও। সোমা, নিজের অবস্থাকে মানিয়ে নিলে সুখ পাওয়া যায় অনেক বেশী। কি, তুমিই বল না?"

সোমা কোন উত্তর করে না, চুপ করে থাকে, একমনে এটা ওটা করে চলে। রাগে অভিমানে ফর্সা নিটোল মুখটা লালচে হয়ে গেছে। আঁচলটা মাটিতে খসে পড়েছে, লুটোচ্ছে, রাগলে ওকে অন্যরকম লাগে।

সোমা কোন উত্তর করে না। চুপ করে থাকে, একমনে এটা ওটা করে চলে। রাগে, অভিমানে ফর্সা নিটোল মুখটা লালচে হয়ে গেছে। আঁচলটা মাটিতে খসে পড়েছে। লুটোচ্ছে। রাগলে ওকে অন্যরকম লাগে। মৃণ্ময় ওঘরে যায়। পা গুটিয়ে ইজি চেয়ারে বসে। সোমা তো আর মাসী-বাড়ী যাবার কথা একবারও বলল না? ভুলে গেছে? তাই বা কি করে হয়। ওতো অফিস থেকে আসা মাত্রও বলল। বাইরের দম মারা আবহাওয়াটা বদলেছে। হাওয়া আসছে জানালা দিয়ে। সোমা অভিমান করেছে। অনেক আশা নিয়ে মৃণ্ময়কে বলেছিল হাই এস্টাবলিসড্ ভাইকে দেখতে যাবে। অত্যাধিক স্ট্যাটাস নিয়ে চলে ওরা। ওতেই সোমার গর্ব।

কেমন জানি মনে হচ্ছে মৃণ্ময় এটা ভাল করেনি। কিন্তু সোমার কথা-গুলোও অসহ্য লাগছিল এমন দিনে। অবশ্য এমন কিই বা বলেছে? মৃণ্ময় ভাববার চেষ্টা করে। শুরু থেকেই নির্বিবাদী স্বামীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে চলে আজ এই সামান্য কথাগুলোই ওর কাছে আশাতীত। একটু ভেবে পাশের ঘর থেকে টুকুকে ডাক দেয়। বলে, "তোর মাকে দেখে আয়তো কি করছে? যেতে হবে না?"

টুকু ছুটে চলে যায়, একটু পরেই ফিরে আসে। "বাপি, মা ওঘরে চুপচাপ শুয়ে আছে। কাঁদছে বোধহয়। সব অন্ধকার। মাকে ডাকব?"

"না থাক, তোরা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে।" সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, গিয়ে আবার ফিরতে হবে তো?"

"কেন বাপি, আমরাও কি যাব? সত্যি?" টুকুর শিশু-মন হঠাৎই একঝলক খুশীতে নেচে ওঠে।

"হ্যা, সকলেই যাব। দেখি আবার তোর মা কি করছে।" মৃণ্ময় ওঘরে যায়। সমস্ত ঘর একেবারে অন্ধকার। কি ব্যাপার? আলো জ্বালেনি কেন সোমা? বিকেলের রোদ ফিঁকে হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এখন ছ'টা বাজে। মৃণ্ময় হাতঘড়িটায় সময় দেখে। একটু ব্যস্ত হয়। ও বাড়ীতে এখনই না গেলে ফিরতে অনেক রাত হবে। যদিও বেশী দূরে নয় মোড় থেকে বাসে কুড়ি মিনিট। তবু ছেলেমেয়েরা, সোমা ও বাড়ীতে গেলে আর উঠতেই চায় না।

মৃণ্ময় একটু ভাল করে লক্ষ্য করে। অন্ধকার ঘরে খোলা জানলায় মুখ ঠেকিয়ে সোমা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মৃণ্ময় দেখতে পায়, কিন্তু এভাবে আগে কখনো তো সোমাকে দেখেনি মৃণ্ময়। সব সময়ই তার কর্মব্যস্ত রূপ। তাতে শৈথিল্য কোথায়? কিন্তু আজ হঠাৎ এভাবে? তবে সোমা কি কাঁদছে? হুঁ-হুঁ তাহলে চোখ মুচছে বারবার। এটাই ওর স্বভাব। একটু অবাক চোখে সোমাকে দেখে মৃণ্ময়। খোলা জানলা থেকে দৃষ্টিটা বাইরে চলে যায়। রাস্তায় রোডলাইট জ্বলছে, একটু আগের দেখা গাঢ় রক্ত লাল পশ্চিম আকাশটা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। এটা কৃষ্ণপক্ষ চলছে, ঘোর কালো আকাশটাকে কালো চাদর মনে হয়। সোমার দৃষ্টিটা বাইরের দিকে, মৃণ্ময়ের উপস্থিতি কি ও টের পেয়েছে? নাকি পেয়েও অভিমানে তাকাচ্ছে না? মৃণ্ময় সুইচ টিপে আলোটা জ্বালে। টিউবের আলোয় সারাঘর আলোময় হয়, পাশের বাড়ীর টি. ভি-তে কোন নৃত্যশিল্পীর প্রোগ্রাম চলছে। খোলা জানালা থেকে দেখা যায়। জানালার পর্দাটা হাট করে উপরে গোঁজা। সোমার কাঁধ থেকে শাড়ীর আঁচল খসে পড়েছে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। শাড়ীটা এলোমেলো, অন্যদিনে এসময়ে অফিস থেকে যখন মৃণ্ময় ফেরে, সোমাকে পরিপাটি দেখে। আজ চুলও বাঁধেনি। কপালের সিঁদুর ঘামে লেপটে গিয়ে পুরো কপালটাই লাল হয়ে গেছে।

সোমা মুখ ফিরোয় একবার, তির্যকভাবে দৃষ্টিটা মৃণ্ময়ের উপর ফেলে মাথা নীচু করে, চোখের কোনায় কালির ছোপ, কাঁদছিল বোধ হয়। মৃণ্ময় যেন হতবাক হয়ে যায়। গতানুগতিক প্রকৃতির থেকে সোমার এক স্বতন্ত্র রূপ দেখে। আজ মায়ের মৃত্যুদিন। নির্জনে একা থাকলে হয়তো মৃণ্ময়েরও চোখ ফেটে

জল আসত। কিন্তু সোমা ! অভিমানে? রাগে? নাকি অনুশোচনায়? মৃণ্ময় বুঝে উঠতে পারে না। ধাঁধাঁ লাগে।

ওঘর থেকে টিংকু, টুকুর উল্লসিত গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। বোধ হয় যাওয়ার আনন্দে। টুকু একবার এসে উঁকিও দিয়ে যায়। হয়তো বাবা-মায়ের অপ্রস্তুতি দেখে বিষন্ন মনে ওঘরে চলে গেল। মৃণ্ময় এগিয়ে গিয়ে জানালার পর্দাটা ফেলে দেয়। এগিয়ে এসে সোমার উষ্ণ পিঠে আলতো হাত রাখে। নিচু স্বরে বলে, "ও বাড়ী যাবে না? সন্ধ্যা হয়েছে, আর দেরী করলে ফিরতে যে রাত্তির হয়ে যাবে।'

সোমা আস্তে আস্তে মুখ তোলে, একবার মৃণ্ময়ের চোখে চোখ রাখে। ফের মাথা নীচু করে। "ভুল বুঝে তোমাকে অনেকগুলো খারাপ কথা বলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

সোমার মুখে এমন কথা একেবারেই আশাতীত, অকল্পনীয়। মৃণ্ময়ের ফের ধাঁধাঁ মনে হয়। সোমার এভাবে কথা বলা, এমন আচরণ! মৃণ্ময়ের মনে বিভ্রান্তি ঘটায়। তবুও মনে মনে এক স্বস্তি পায় সে।

"দূর বোকা," মৃণ্ময় আরও ঘন হয়। "এতে মনে করার কি আছে? শুধু স্মরণ করে দিয়েছি তোমাকে, নতুন কিই বা বলেছি?"

সোমা মুখ লুকোয় যেন মৃণ্ময়েরই বুকে।

'সোমা, আমরা প্রত্যেকেই কাজের মধ্যে অযথা জটিলতা আনি। পরে আমরাই তার শিকার হই। সকলেই যদি সবকিছু প্রথমেই বুঝত তবে তো তার বাঁচার আসল সত্যটাই নষ্ট হয়ে যেত। কোন একজন মহাপুরুষ বলেছিলেন, "ভুলই মানুষের সঠিক পথ বাৎলে দেয়।" অনেক বেলা হল। লক্ষ্মীটি, পোশাক পরে নাও। বেরুতে হবে।"

"আজ থাক না, আজকের দিনটাতে অন্য কোথাও নাই বা গেলে।"

"সোমা?" মৃণ্ময় অবাক হয়।

"আজ মায়ের মৃত্যুদিন, মায়ের ফটোটা থেকে রজনীগন্ধার গন্ধ আসছে। জানো, মাকে আমি কোনোদিন এভাবে মনে করিনি গো, করতে পারি নি, তখন শুধু অসহ্য মনে হয়েছে, কথা, অস্তিত্ব সমস্ত কিছুই। কোনদিন মাকে বুঝতে

চেষ্টাই করিনি। কিন্তু আজ সমস্ত ভুলে মাকেই সবচেয়ে কাছে ভাবতে, পেতে ইচ্ছা করছে গো, মা হয়তো আগেই আমাকে ক্ষমা করেছে, মায়েরা কখনো অভিশাপ দেয় না অভিযোগ তুলে। আমিও তো মা। টিংকু, টুকুর কখনো খারাপ কিছু ভাবতে পারি বলো? তাইতো মায়ের কাছে আজ নতুন করে ক্ষমা চেয়ে নেব।"

—সোমা! মৃণ্ময় বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। অভিভূতের মত কথাগুলো শুনছে। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে চায় না। কি বলছে সোমা! মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা বুঝি আজ পূর্ণ হল। ওঘর থেকে মায়ের প্রথম মুখটা মৃণ্ময় দেখে এসেছে, মা যেন হাসছে। পরিতৃপ্তির হাসি, অনেক কিছু পাওয়ার পরে যেন এক প্রশান্ত হাসি।

মৃণ্ময় সবকিছু ভুলে সোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। বুকের মধ্যে সোমার কান্না, বুকের হিন্দোল বুঝতে পারে মৃণ্ময়। ওরই বুকের উষ্ণতায় উত্তেজনা বুঝতে পারে। বেশ খানিকক্ষণ যায়।

সোমা তখনও কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। পাশের বাড়ীর টি. ভি. তে এখন কোন এক শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। "কাছে ছিলে, দূরে গেলে, দূর হতে এসো কাছে।" মৃণ্ময় তাই মন দিয়ে শোনে

প্রতাপ দত্ত

রুণা জানলার গরাদে গাল চেপে ধরে দাঁড়িয়েছল চুপচাপ। ক্ষোভ, অভিমান, হতাশা সব মিলিয়ে বুকের মধ্যে চলছিল ঢেউ-এর উঠাপড়া। চোখ দুটো ঝাপ্‌সা। সামনের দিকে তাকিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওর চোখে পড়ছিল না কিছুই। হঠাৎ 'কিড়িং' করে সাইকেলের বেল বাজতেই সম্বিত ফেরে— পিয়ন। চোখ মুছে তড়িৎ পায়ে ছুটে এল বাইরে। পিয়ন 'চিঠি' বলে হাঁক পেড়ে খামটা ছুঁড়ে দিল বারান্দায়। রুণা দ্রুত কুড়িয়ে নিল। খামের উপর লেখা নামটার উপর চোখ পড়তে বুকের রক্ত উদ্বেল হল। পরিচিত হস্তাক্ষর। দীপ. দীপের চিঠি এল অবশেষে।

চকিত-দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিল রুণা। না, কেউ নেই। বাবা অনেক্ষণ হল কোর্টে চলে গেছেন। মা বাথরুমে। দাদা-বৌদি বেরিয়েছে বিয়ের কেনাকাটা সারতে। আর তো মোটে চারদিন বাকী. কাল-পরশু থেকেই আত্মীয়-স্বজনরা সবাই এসে পড়বে। সারা বাড়ী গম গম করে উঠবে। আর পাঁচটা মেয়ের মতো এমনি একটা উৎসবের দিনের কল্পনা রুণারও ছিল। কিন্তু আজ ভাবতেই কান্নায় বুক ভারী হয়ে উঠছে।

খামটার দিকে তাকাল রুণা। কি লিখেছে দীপ? ২৮শে শ্রাবণ দিনটি কেমন রূপে দেখা দেবে রুণার কাছে? সেদিন কার হাত ধরে চলা শুরু হবে রুণার? দীপ রায়? না কি ঐ যার নামে রঙীন কার্ড ছাপা হয়েছে সেই অমিত চ্যাটার্জী?

খামটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এল রুণা। দরজা বন্ধ করে বার করল খামটা। ওর হাত কাঁপছিল থরথর করে। গত পনের-কুড়িদিন ধরে চিঠিটার আশায় থাকতে থাকতে ও ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আজ কিছু আশা করতেই ভয় হয় আশা-নিরাশার দু-নৌকায় পা দিয়ে দুলতে দুলতে চিঠিটা মেলে ধরে চোখের সামনে। সাদা-মাটা মামুলি চিঠীটার দুটো লাইন-ই বিশেষ। দীপ লিখেছে—

...ঠিকানায় সামান্য ভুল থাকায়, অনেক দেরীতে পেয়েছি চিঠি। আর একটা খবর জানাই। আমাদের বন্ধু অপু একদিন ট্রাংককল করেছিল, অনেক

কথা হল। আমি ১৪ই তারিখে কলকাতা যাচ্ছি। আশাকরি বিয়ের আগেই তোমার সাথে দেখা হবে। তুমি থাকবে আশা করি।

ইতি দীপা।

চিঠিটা গালে চেপে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে রুণা। একটু পরে সামলে নিয়ে আবার পড়ে চিঠিটা। পড়তে পড়তে ওর কান্না ভেজা চোখে হাসি চিক্‌চিকিয়ে ওঠে। দীপের মিষ্টি. কমনীয় মুখের জন্য অপু ওকে দীপা বলে খ্যাপায়। বুদ্ধি করে ছেলে ঐ নামটা দিয়েছে। চিঠিটা অন্য কেউ পড়লেও ক্ষতি নেই। রুণা তো বাড়ীব লোকেব নজব বন্দী। ওর সব কিছুই ওদেব চোখে সন্দেহজনক। যদিও দীপেব নাম জানে না কেউ। দীপকে সব সন্দেহের বাইবে রেখে ব্যাপারটার একটা ফযসালাব চেষ্টাই প্রথমে কবেছিল রুণা, তাতে সফল না হলেও শত জেরাতে নামটা ফাস কবেনি। প্রথম যেদিন মায়ের কাছে কেঁদে পড়েছিল সেদিন রুণা দীপ এর ছায়া ও অনুমান কবতে দেয়নি তাঁকে। বলেছিল—'মা আমি বিয়ে করব না।

—'কেন?'

'আমি আরো পডব মা।'

মা হেসেছিল, 'বোকা মেয়ে, বিয়ের জন্যই তো পডা, অত ভাল বিরে হচ্ছে তো আর পডে কববি কি?'

রুণা বিরক্তি দেখিয়ে বলেছিল, 'মা সেকেলেপনা কোর না, আজকাল মেয়েরা বিয়ের জন্য পড়ে না।'

'—তা নয় হল। কিন্তু অমন ভাল পাত্র হাতছাডা করলে আর এমনটি জুটবে?'

—'না জুটলে না জুটবে, আমি বিয়ে করব না।'

—অ, তারপর সারাজীবন আইবুড়ি হয়ে থাকবি? তোর মতলবটা কি শুনি? কি চাস তুই?'

চুপ কবে থাকে রুণা। কি যে চায় তা কেমন করে বলবে? ওর ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার কার বলে 'আমি দীপকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।'

কিন্তু বলতে পারে নি রুণা। ও নিজেই নিশ্চিত ছিল। দীপ যে ওকে

বিয়ের কথা বলতে পারে নি, সে অবকাশ ও পায়নি। দীপ যতদিন চাকরি পায়নি ততদিন সে প্রশ্নই আসে নি। যেদিন চাকরি পেল, সেদিন কথা বলার সময়ই পেল না। তাড়াতাড়ি ওকে চলে যেতে হল বম্বে। যাওয়ার সময় বলে গেল 'রু' খুব তাড়াতাড়ি আবার আসব আমি, তোমাকে একটা জরুরী কথা বলার আছে।

দীপের জরুরী কথা রুণা অনুমান করতে পারে। তবু অনুমানটাকে স্থির বিশ্বাসে বদলে নেওয়ার জন্য দীপের আসার অপেক্ষায় ছিল ও, সে টুকু প্রয়োজন ছিল ওর, কারণ দীপের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ এতটা গভীর হওয়ার সময় পায়নি যে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে ভেসে পড়া চলে। যদিও দীপ ওর অনেকদিনের চেনা, অপুর মাসতুতো ভাই। অনেকবার দেখেছে অপুর বাড়ীতে। ভাললাগা ছিল ওর মনে, তবু রুণার চোখে কখনও বিশেষ কেউ হয়ে ওঠেনি দীপ। যেটা হল মাত্র কমাস আগে, অপুর বিয়ের দিন।

সন্ধ্যালগ্নে ছিল বিয়ে। অপুকে সাজিয়েছিল রুণা। ওকে সাজাতে সাজাতে সন্ধ্যে। নিজের সাজ করার সময়ই পাননি। শেষে তাড়াহুড়ো করে সাজ শেষ করতে করতে বর এসে গেল। সবাই দৌড়াল বর দেখতে। রুণা গলায় হারটা পরতে পরতে দৌড়াল নীচে। সবাই তখন গেটে ভিড় করে বরণ দেখছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল দীপ। দ্রুত নামছিল রুণা। কি হচ্ছে বোঝার আগেই প্রচণ্ড ধাক্কা। মুহূর্তে পায়ের তলা থেকে সিঁড়ির ধাপ হারিয়ে গেল রুণা। আর্ত চিৎকার করে পড়তে পড়তে দীপের কাঁধটা খামচে ধরল রুণা। ডান হাত দিয়ে তার পতনোন্মুত শরীরটাকে আটকাল দীপ। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে এল রুণার চোখে। চোখ তুলে তাকাল দীপের দিক। দীপ মৃদু হেসে বলল, 'এত তাড়া কিসের? বর কি পালিয়ে যাচ্ছে? গেলেও ধরতে অপু বাদ দিয়ে আপনার দৌড়ানটা কি ঠিক?'

অপ্রস্তুত রুণা ছদ্মকোপে চোখ ঘুরিয়ে বলে—'আহা তাই আর কি? ধাক্কাটা তো আপনিই মারলেন।'

'আ-চ্ছা। হাত-পা ভাঙা থেকে বাঁচালুম এই তার পুরস্কার?' এই দেখুন কি করেছেন? দীপ পাঞ্জাবি সরিয়ে ঘাড়ের কাছটা দেখায়। রুণার লম্বা নেলপলিশ পরা নখের আঁচড়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠেছে সেখানে। এবার